উৎসর্গ।

যাঁহার উদ্দেশে প্রবাস হইতে পত্রগুলি লিখিত হইয়াছিল,—তাঁহার নামে এই প্রবাসের পত্র উৎসর্গ করা হইল।

বিজ্ঞাপন।

প্রবাসের পত্রের অধিকাংশ আমার "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত হইল। পূনা, দণ্ডকারণ্য ও ভারতরমণীর চিত্র, এই তিন খানি পত্র নূতন প্রকাশিত হইল।

কবিবর নবীন বাবু, আমার অনুরোধে, পত্রগুলি মুদ্রিত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। সাধারণের জন্য পত্রগুলি লিখিত হয় নাই। নবীন বাবু ভ্রমণ-উপলক্ষে যেখানে যাইতেন, সেখান হইতে সহধর্ম্মিণীকে পত্র লিখিতেন। পত্রগুলিও তাড়াতাড়ি লেখা, হয় ত রেলওয়ে ষ্টেষনে ট্রেণের অপেক্ষায় বিশ্রামগৃহে বসিয়া আছেন, এবং পত্র লিখিতেছেন। তবু পত্রগুলি মনোরম হইয়াছে। সাহিত্যের অনেক পাঠক প্রবাসের পত্রের প্রশংসা করিয়াছেন। এক্ষণে প্রবাসের পত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল, আশা আছে, সাদরে পরিগৃহীত হইবে।

২রা আশ্বিন।
১২৯৯।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
প্রকাশক।

সূচীপত্র।

প্রবাসের পত্র।

দার্জিলিঙ্গ।

ঈশ্বরের কৃপায়, আমার এই বিপদ্‌সঙ্কুল জীবনের একটি সুখস্বপ্ন অংশতঃ সফল হইল,—আমি দার্জিলিঙ্গ দেখিলাম। সেই মহিমার মূর্ত্তি হিমাচল দেখিলাম। বাল-সূর্য্য-কিরণে প্রদীপ্ত, তপ্ত-কাঞ্চনাভ কাঞ্চনশৃঙ্গ দেখিলাম, জগতে বুঝি এমন মহান্ দৃশ্য আর নাই! হিমাদ্রি পার্শ্ব ও সানুস্থিত, শৈবিমালায় পুষ্পিত, শীতল-পাদপ-শ্রেণীতে উপবনীকৃত, দার্জিলিঙ্গের মনোহারী চিত্রখানি নয়ন ভরিয়া দেখিলাম। ততোধিক সুখের কথা, আমার শৈশবসুহৃদ্ অভিন্নহৃদয়, সহৃদয়তায় কামিনী-কোমল, উমেশকে দেখিলাম। আর দেখিলাম তাহার উমাকে! স্বামী উমেশ, ভার্য্যা কেদার-কামিনী। "অখণ্ডপুণ্যানাং ফলমিব" না হইলে, বোধ হয়, পতি এমন পত্নী, ও পত্নী এমন পতি লাভ করিতে পারেন না।

শৈশব হইতে প্রকৃতির মহাপ্রদর্শনভূমি পার্ব্বতী-মাতার (চট্টগ্রাম) অঙ্কে যে বিরাজ করিয়াছে, দার্জিলিঙ্গে তাহার পক্ষে দেখিবার অভিনব দৃশ্য তত কিছুই নাই। গিরিপার্শ্ববাহী 'রেলওয়েটি' যেরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া,—স্তরে স্তরে, পর্ব্বতের পাদমূল

হইতে ঊর্দ্ধে মেঘমালা ভেদিয়া উঠিয়াছে, নগরাজ যেন বক্ষে স্তরে স্তরে উপবীত ধারণ করিয়াছেন,—উহাই কেবল দেখিবার যোগ্য। স্থানে স্থানে যখন মেঘজাল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিলাম, তখন স্থানে স্থানে নীচে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। জগৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল হিমাদ্রি, আকাশের সীমা দেখাইয়া, হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ ও আতঙ্ক জন্মাইতেছিল। আর দেখিবার যোগ্য, প্রভাত-অরুণালোকে স্বুবর্ণ-মণ্ডিত কাঞ্চনশৃঙ্গ বা কাঞ্চন-জঙ্ঘা।

উমেশের উমা সম্বন্ধে আর দু' চার কথা না লিখিলে, তুমি বিরক্ত হইবে। হিমালয়ের অঙ্কে, উমা-উমেশ-শোভা, এই শরৎকালে সন্দর্শন, আমি আমার জীবনের একটি প্রকৃত দুর্গোৎসব বলিয়া চির দিন মনে রাখিব। দার্জিলিঙ্গ আজ আমার চক্ষে একটি পুণ্যতীর্থ। ঠাকুরাণীটিকে দেখিতে প্রথম আমাদের মধু বাবুর ফুলেশ্বরীর মত বোধ হয়। কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে, এ ফুলেশ্বরী সম্বন্ধে বলিতে হয়,—

"ওরে প্রিয় ফুল তুলনা যে নাই,
কি তুলনা দিব?
মিছে কি বলিব?
অতুলন তোরে বলিছে সবাই।"

এ ফুলেশ্বরীর গাম্ভীর্য্যমাখা ঈষৎ হাসিটুকু,—জ্যোৎস্নার কোলে ঈষৎ বিজুলী সঞ্চার,—মধুমাখা স্নেহটুকু, বৈশাখী জ্যোৎস্নার অমৃতভরা ভাবটুকু, বুঝি সেই ফুলেশ্বরীতে নাই। তাঁহার অঙ্কে দুইটি পুত্র-কুসুম বিরাজিত। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, তাহারা দীর্ঘজীবী হইয়া মাতার উজ্জ্বল মুখ আরো উজ্জ্বল

করুক! আমারও দুই বন্ধুর অদৃষ্ট সমান। আর একটি পুত্র, অঙ্ক শূন্য করিয়া, মাতার ঐ দেবীমূর্ত্তিতে বিষাদের ছায়া মাখাইয়া দিয়া, চলিয়া গিয়াছে। পতি-পত্নীর ভালবাসায় আজ দার্জ্জিলিঙ্গ আমার চক্ষে যথার্থই কৈলাস,—দুইটি দিন স্বর্গসুখে অতিবাহিত করিতেছি।

বৈদ্যনাথ।

পথে কয়েক ঘণ্টা কাল বৈদ্যনাথে ছিলাম। শ্রীক্ষেত্র যে দেখিয়াছে, তাহার কাছে বৈদ্যনাথে দেখিবার কিছুই নাই। শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরের অনুকরণে একটি প্রাঙ্গণ। মধ্যস্থলে একটি মন্দিরে বৈদ্যনাথ। বলিতে হইবে না যে, তিনি লিঙ্গরূপী। প্রাঙ্গণের চারি দিকে, মন্দিরে নানা দেব দেবী। অধিকাংশই বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, যেঁখানে বুদ্ধ-মূর্ত্তি কোনও মতে লুকাইবার যো নাই, সেখানে তাঁহার নাম "কাল-ভৈরব" হইয়াছে। বৈদ্যনাথ, দেওঘর বা দেবঘর, অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আমার তত ভাল লাগিল না।

বৈদ্যনাথে, "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক শিশির বাবু ও তাঁহার সহোদর মতি বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ইহাঁরা যশোহরের বন্ধু—বেশ আদর করিলেন। প্রাতে তাঁহারা আহার করাইলেন। সেই ঘোরতর ব্রাহ্ম দুই ভাই এখন ঘোরতর বৈরাগী; এখন প্রত্যহ তাঁহারা পূজা আহ্নিক করেন। কলিকাতা ছাড়িয়া, শিশির বাবু বৈদ্যনাথে আশ্রমবাসী হইয়া, সস্ত্রীক নির্জ্জনে

থাকেন। দেখিলাম,—আমার জীবনের সেই স্বপ্ন, শিশির বাবু কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী রাঁধেন, তিনি পার্শ্বে বসিয়া "অমৃতবাজারের" সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। বৈরাগ্য এত দূর যে, ঘরে বসিবার আসন খানি পর্য্যন্ত নাই। খবরের কাগজ বিছাইয়া বসিয়া, অতি তৃপ্তির সহিত, তিন জনে আহার করিলাম। তাঁহারা এক জন বৈরাগী সঙ্গে রাখিয়াছেন। তিন জনে মিলিয়া, বৈষ্ণব কবিদিগের সেই সকল কবিতা গাইলেন। কর্ণে অমৃতবর্ষণ হইল, হৃদয় গলিয়া গেল, চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ভায়ে ভায়ে মিলিয়া এ কীর্ত্তন, আমি ত জীবনে ভুলিব না। বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতায় কি যে প্রেমামৃত আছে, তাহা যত পান করা যায়, কিছুতেই পিপাসা মেটে না। তাঁহারা গাইলেন,—

"দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে তোমারে নয়নে দেখি,
বেড়াইয়া ভুজলতা হৃদয়ে হৃদয়ে রাখি।"

প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সেই অবস্থায় দেওঘর ছাড়িলাম।

প্রয়াগ।

"স্থানীয় ন্যাশন্যাল কংগ্রেস্" সভার দুইটি অধিবেশন দেখিতে গিয়াছিলাম। কোট্-হ্যাট্-ধারী বাঙ্গালী দাঁড়কাকগুলির মধ্যস্থলে,—মরি! মরি!—কি একটি মূর্ত্তি দেখিলাম। মাথায় উষ্ণীষ, গলায় উড়ানি, গায়ে চাপকান, পরিধানে ধুতি। ইহাঁর নাম—মদনমোহন মালবী। এই ত জাতীয় বেশ। কিন্তু যখন লোকটি

কথা কহিতে লাগিলেন, আমার ভ্রম হইল, পশ্চাৎ হইতে বুঝি খ্যাতনামা ডব্‌লিউ, সি, বনার্জি,—হায় রে বাঙ্গালী নামের দুর্গতি,—ইংরাজি বলিতেছেন। লোকটির প্রতি আমার বড় শ্রদ্ধা হইয়াছিল। কাল হরিমোহনকে সঙ্গে করিয়া, তাঁহাকে দেখিতে যাই। তিনি হরিমোহনদের সহপাঠী ছিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল দুই জনে আলাপ করিলাম, যেন দুই জনের প্রাণে প্রাণে মিশিয়া গেল। ইনি সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে পারদর্শী। তাহা ছাড়া অন্য অন্য ভাষাও জানেন; বাঙ্গালা পর্য্যন্ত বুঝেন। আমার নাম পূর্ব্বে জানিতেন। তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বী, সাহিত্যানুরাগী, স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে প্রস্তুত। আমি যখন গীতার উল্লেখ করিলাম, তিনি আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, তিনি প্রত্যহ প্রাতে এক অধ্যায় গীতা পাঠ করেন। আমাদের উভয়ের হৃদয়ের গতি এক। সেই মহাভারতীয় মহানীতির কেন্দ্রস্থলে যেমন মদনমোহন, পশ্চিমভারতের বর্ত্তমান নীতি-যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে—তেমনই এই মদনমোহন। ইংলণ্ডের "ওকবৃক্ষ"—অতিশয় সারবান্ বৃক্ষ, কিন্তু ভারতের চন্দনবৃক্ষের সৌরভ তাহাতে নাই। আমি তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছি যে, আমি তাঁহাতে ইংলণ্ডের "ওকের" সারবত্তার সঙ্গে, ভারতের চন্দনের সুগন্ধ দেখিবার প্রত্যাশা করি।

কানপুর।

আজ আমি কানপুরে। সৌজন্যতার প্রতিমূর্ত্তি, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কানপুরের খ্যাতনামা ডাক্তার, আমাকে ষ্টেশন হইতে সাদরে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া আসেন। তিনি দাসত্ব-শৃঙ্খল-চরণে ঠেলিয়া, এখানে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতেছেন, কানপুরে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা। তাঁহার গৃহের নিম্নতল ডাক্তারখানা, উপরের প্রকোষ্ঠ সকল আবাসগৃহ। ডাক্তারখানা শুনিয়া তুমি হয় ত কেষ্টার-অয়েল, চিরতা ও কুইনাইন মনে করিয়া নাক সিটকাইতেছ। এ তাহা নহে, মহেন্দ্র বাবুর ডাক্তারখানা একটি ক্ষুদ্র ইন্দ্রালয়। এমন সুন্দর সুসজ্জিত বাঙ্গালীর ডাক্তারখানা কোথাও দেখি নাই। ডাক্তারখানার মধ্যে তাঁহার বসিবার কক্ষটির গবাক্ষ সকল সুরঞ্জিত চিত্র দৃশ্যাবলীর দ্বারা সুসজ্জিত! কক্ষের প্রাচীরে চীনদেশীয় নরনারীর বিচিত্র চিত্র সকল শোভিতেছে। কক্ষস্থিত দ্রব্যাদি ঝক্ ঝক্ করিতেছে! তাঁহার সঙ্গে অল্প ক্ষণ আলাপের পর এতদূর সমপ্রাণতা হইয়াছে, এবং তিনি এত আদর করিতেছেন যে, আমার কানপুর ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেছে না।

অদ্য প্রাতে কানপুর পরিদর্শনে বাহির হই। প্রথমতঃ গঙ্গার পয়ঃপ্রণালী দর্শন করিয়া নয়ন তৃপ্ত করি। হরিদ্বারে গঙ্গার গর্ভে বাঁধ দিয়া একটি জল-স্রোত সোপানে সোপানে ঊর্দ্ধ হইতে এই কানপুরে আসিয়া আবার গঙ্গায় পড়িয়াছে। জগৎপ্রাণ

হইতে যেন একটি মানব-জীবন-স্রোত উৎপন্ন হইয়া, আবার জগৎ-প্রাণ-গর্ত্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে। এক সোপান হইতে সোপানান্তরে জলরাশি গর্জ্জন করিয়া শ্বেত-কুসুম-নিভ ফেণমালায় বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, সে দৃশ্য অতি সুন্দর! তবে তুমি যখন উড়িষ্যার 'কেনাল' দেখিয়াছ, তখন তোমার ইহা তত নূতন ও চমৎকার বলিয়া বোধ হইবার কথা নহে। এই 'কেনেলের' স্রোতোবেগে পরিচালিত হইয়া, স্থানে স্থানে যে সকল ময়দার কল চলিতেছে, তাহা কিন্তু তুমি দেখ নাই।

কৃষ্ণের একটি মধুমাখা নাম 'কানাই' বা 'কান', তাহা তুমি জান। বোধ হয়, 'কান' হইতেই এ স্থানটির নাম কানপুর হইয়াছে। এরূপ পবিত্রস্থান আজ একটি শোকসিন্ধু। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে যেরূপ নৃশংস দৃশ্য সকল এখানে অভিনীত হইয়াছিল, এমন আর কোথাও হয় নাই। বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে, স্থানীয় ইংরাজ কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণ যে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, একবিংশতি দিবস অতুল সাহসে বিদ্রোহীদিগের প্রতিকূলে আত্মরক্ষা করেন, সে স্থানটি আজ একটি মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহার মধ্যস্থলে, উচ্চ সৌধ-চূড়ায় শোভিত, কারুকার্য্য-শোভিত—একটি গির্জ্জা। তাহার প্রাচীরে শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মর-প্রস্তরে, আত্মরক্ষায় যাঁহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাঁহাদের আত্মীয় ও সহযোদ্ধারা, তাঁহাদের স্মরণলিপি লিখিয়া রাখিয়াছেন। মাতা পিতা পুত্রের জন্যে কাঁদিতেছেন, ভগিনী ভ্রাতার জন্যে কাঁদিতেছেন, অনাথিনী বিধবা পতির জন্যে কাঁদিতেছেন। এ সকল শোকলিপি পড়িবার সময়, অশ্রুসম্বরণ বড় কঠিন হইয়া পড়ে। একজন সৈনিক, দুর্গাবদ্ধ, প্রপীড়িত ও পিপাসাতুর

রমণী ও শিশুদের জন্যে, পার্শ্বস্থিত কূপ হইতে জল আনিতে গিয়া, আহত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হন। তাঁহার শোকলিপির নিম্নে, একটি কৃত্রিম কূপ গির্জার মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার পবিত্র জলে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়া থাকে। আমার ইচ্ছা হইল, এই আত্মবিসর্জ্জনের পবিত্র সলিলে দীক্ষিত হইয়া জীবন সার্থক করি। বেদীর উর্দ্ধে গবাক্ষ শ্রেণীতে নানাবর্ণের কাচে খৃষ্ট-জীবনের নানাবিধ দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে। অথচ আমরাই পৌত্তলিক! কেন্দ্রস্থলে মহর্ষি খৃষ্টের ক্রুশে মৃত্যুর সেই শোকাবহ দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে। এমন পবিত্র শোকচিত্র বুঝি আর নাই। চিত্রতলে একটি শ্বেতপ্রস্তরের ক্রশ, তিনটি রক্তবর্ণ রত্নে খচিত হইয়া শোভা পাইতেছে। গির্জ্জার বাহিরে একটি সুন্দর সমাধি। যে সকল ইংরাজেরা কানপুরের শেষ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অস্থিরাশি এখানে প্রোথিত রহিয়াছে। যে কূপ হইতে উক্ত সৈনিক জল আনিতে গিয়া বিদ্রোহীদের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন, সে কূপটি এখনও সেইরূপ অবস্থায় আছে। তাহার দুই স্থানে এখনও তোপের গোলার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

২১ দিবস যুদ্ধের পর, ইংরাজগণ অনাহারে ও যুদ্ধের উপকরণ অভাবে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলে, বিদ্রোহনায়ক নানার হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। নানা তাঁহাদিগকে লক্ষ্ণৌ যাইবার অনুমতি দিলে, তাঁহারা নৌকারোহণ করিবামাত্র, বিদ্রোহীগণ তীর হইতে গোলা গুলি বর্ষণ করিয়া, সমস্ত তরণী দগ্ধ ও জলমগ্ন করিয়া দেয়। যে ঘাটে তাঁহারা নৌকায় উঠেন, তদবধি, উহা "বধঘাট" বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। এই ঘাটে শিব-শূন্য

একটি মন্দির এখনও বিরাজিত রহিয়াছে। মানুষ যখন হিংসা-প্রণোদিত হইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন, এরূপ পবিত্র স্থান,—মাতা ভাগিরথীর বক্ষ পর্য্যন্ত কলুষিত করিতে শঙ্কিত হয় না! মানুষ-পশুর মত এমন হিংস্র পশু জগতে নাই। এই বধঘাটে দাঁড়াইয়া আমার বোধ হইল, যেন আমি সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য নয়নে দেখিতেছিলাম। সেই শত শত নর-নারীর ও সুকুমার শিশুর রোদননিনাদ যেন পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর বক্ষ প্লাবিত করিয়া, আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। পার্শ্বে রজকেরা সারি বাঁধিয়া কাপড় ধুইতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, ভারতমাতার বক্ষ হইতে কি কেহ এ কলঙ্ক এইরূপে ধুইয়া ফেলিতে পারে না?

সেখান হইতে সৈন্যনিবাসমালা অতিক্রম করিয়া, 'সবেদা-কুঠি' দেখিতে যাই। এটি নানার কানপুরস্থ আবাস-গৃহ ছিল। গৃহটি এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহার পার্শ্বে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরেজদের কানপুরের শেষ যুদ্ধ হয়। তিন দিক হইতে তিন জন খ্যাতনামা সৈন্যাধ্যক্ষ আক্রমণ করিলে, ত্রিবেণীর তরঙ্গ-তাড়িত তৃণরাশির ন্যায়, সৈন্যাধ্যক্ষবিহীন বিদ্রোহীরা গঙ্গার সেতু বাহিয়া পলাইতে আরম্ভ করে। তখন প্রতিহিংসা-মত্ত ইংরাজেরা তোপের দ্বারা সহস্র সহস্র নর-নারীকে জলমগ্ন করিয়া নিহত করেন। কেবল এক পক্ষেই নৃশংসতার অভিনয় হয় নাই!

তাহার পর, মহেন্দ্র বাবু স্বয়ং আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া, কানপুরের শীর্ষঘাট দেখান। ইহাতে এক দিকে পুরুষ ও অন্যদিকে স্ত্রীলোকদের স্নান করিবার স্থান নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

অসংখ্য নর-নারী—অ ্য একাদশী—গঙ্গায় অবগাহন করিতে-ছিল। তুমি কাশীর ঘাট দেখিয়াছ। কানপুরের শীর্ষঘাট তাহার কাছে অতি ক্ষুদ্র হইলেও, দেখিতে অতি সুন্দর। সম্মুখের মিউনিসিপাল উদ্যানের উপর দিয়া ঘাটের খিলান-শ্রেণী দেখিতে অতি সুন্দর।

তাহার পর যাহা দেখিলাম, তাহা এ জীবনে ভুলিব না। একটি গৃহে আবদ্ধ করিয়া, অসংখ্য নর-নারী ও শিশুগণকে নানাসাহেবের অনুচরেরা বধ করিয়া, হত ও আহত অবস্থায়, তাহাদিগকে পার্শ্বস্থিত একটি কূপে নিক্ষেপ করে। গৃহটি এখন নাই। এরূপ পাপচিহ্ন না থাকাই ভাল। তাহার স্থানে একখানি মার্বেল-ফলক মাত্র আছে; তাহার বক্ষে 'বধ-গৃহ' এই কথাটি মাত্র লেখা আছে। আর যে কূপে হত ও আহতদের নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার উপর কি বিষাদময়ী মূর্ত্তিই স্থাপিত হইয়াছে! একটি অনিন্দ্যসুন্দরী, শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিতা, যুগলপক্ষবিশিষ্টা স্বর্গীয় দেবী, বক্ষের উপর হস্ত রাখিয়া, করে দুইটি তালের অস্ফুট শাখা ধরিয়া, অধোবদনে কূপের দিকে চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন! মূর্ত্তিটি জীবন্ত শোক! দেখিলে হৃদয়ে কি শোক, কি পবিত্রতা সঞ্চারিত হয়, তাহার ভাষা বুঝি নাই। চারি দিকে উচ্চ প্রস্তরের "রেলিংয়ের" মধ্যে মূর্ত্তিটি রক্ষিত হইয়াছে। মহেন্দ্র বাবুর কৃপা ভিন্ন আমি উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতাম না। সমস্ত স্থানটি ব্যাপিয়া, এখন একটি বিস্তৃত, পুষ্পবৃক্ষ-শোভিত উদ্যান। এমন হৃদয়স্পর্শী স্থান বুঝি আর জগতে নাই!

লক্ষ্ণৌ

কাল সকালের ট্রেণে লক্ষ্ণৌ গিয়া, একজন ইংরাজের হোটেলে ছিলাম। তাঁহাকে [illegible]ড়কাটি করিয়া, কাল সমস্ত দিন, নগর দর্শন করিয়াছিলাম। আজ আবার মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া, তোমাকে পত্র লিখিলাম।

ভগবান্ বিশ্বরূপ, তাঁহার বিশ্বও বহুরূপী। কাল, মুহূর্তে মুহূর্তে তাহার রূপান্তর করিতেছে। রামচন্দ্রের রাজ্যের নাম কোশল ও রাজধানীর নাম অযোধ্যা ছিল। কালে, রাজ্য ও রাজধানী, উভয়ই মোগল-সাম্রাজ্যের ছায়ায় বিলীন হইয়া যায়। ক্রমে, [illegible] মোগলসাম্রাজ্যে কালের ছায়া পতিত হইলে, রাম-রাজ্যে যিনি দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি তাঁহার মস্তকোপরি স্বাধীনতার ছত্র উড়াইলেন। তাঁহার রাজ্যের নাম হইল অযোধ্যা, রাজধানী লক্ষ্ণৌ। তাঁহার রাজপ্রাসাদশিরে, স্বর্ণছত্র উড়াইয়া, তাহার নাম রাখিলেন "ছত্র-মঞ্জিল।" কালে, আবার বৃটিশসিংহ কবলে করিয়া, সেই ছত্রধারীকে 'মেটিয়া-ব[illegible] রাখিলেন,—তিনি সেই কারাগার হইতে [illegible] কাঁদিলেন। ভারত কাঁদিল, সেই হৃদয়দ্রবকারী শোক-সঙ্গীতে চিরদিন কাঁদিবে। বন্দী ওয়াজিদ আলি সাহার [illegible] হইয়াছে; তাঁহার সকল যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ [illegible], আজ অযোধ্যার নবাবদিগের সমাধিমাত্র। কালে, সেই

রাজ্যের নাম হইয়াছে "আউড্", রাজধানীর নাম "লখ্‌নাও" ভারতব্যাপী বৃটিশ-ছত্রের ছায়াতে "ছত্র-মঞ্জিলের" ছত্র বিমলিন হইয়া লুকাইয়া গিয়াছে।

সিপাহি-বিদ্রোহের সময় লক্ষ্ণৌও একটি কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল। চারি দিক্ হইতে সহস্র সহস্র বিদ্রোহী লক্ষ্ণৌতে সমবেত হইয়া, যে স্থানে ইংরাজ প্রতিনিধি বা 'রেসিডেণ্ট' বাস করিতেন, তাহা আক্রমণ করে। এই আবাসস্থানের নাম "রেসিডেন্সি।" স্বল্প সৈন্য এবং এ অঞ্চলের ইংরাজ নরনারী সমবেত হইয়া, ছয় মাস কাল এ স্থান রক্ষা করেন। তাহার পর, বহির্ভাগ হইতে ইংরাজ সৈন্য আসিয়া, বিদ্রোহীদিগকে পরাজয় করিয়া, তাঁহাদিগকে উদ্ধার করে। এই ছয় মাসের দারুণ অবরোধের ইতিহাস, স্থানটির অঙ্গে অঙ্গে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তোপের গোলাঘাতে সমস্ত গৃহাদির ছাদ ধসিয়া গিয়াছে। যে সকল দেওয়াল এখনও দাঁড়াইয়া আছে, তাহাও তোপের ও বন্দুকের গোলা গুলিতে বাহির দিক্ বোলতার বাসার মত হইয়াছে। ভিতরের দিক্ নর-শোণিতে রঞ্জিত রহিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগকে মাটীর ভিতরে 'তয়খানাতে' রাখা হইয়াছিল। তাহার ভিতর পর্য্যন্ত একটি গোলা গিয়া, একটি রমণীর মস্তক উড়াইয়া লইয়া যায়! সেই গোলার দাগ, রমণীর শোণিতচিহ্ন, এখনও দেয়ালে আছে। ইংরাজ জাতির মধ্যে 'হেন্‌রি লরেন্সের' মত দেবতুল্য ব্যক্তি ভারতে কখন আইসেন নাই। তাঁহার হৃদয় ভারতের দুঃখে নিরন্তর দুঃখী ছিল। তাঁহার মত-অনুসারে রাজ্য পরিচালিত হইলে, বিদ্রোহ ঘটিত না। তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে পলায়ন করিলে, আজ ভারতে ইংরাজ থাকিত কি না, সন্দেহ। কর্ত্তব্যের

অনুরোধে তিনি 'রেসিডেন্সি' ছাড়েন নাই[illegible]নে তিনি আহত হন, যেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়, উভয় স্থান এখনও চিহ্নিত রহিয়াছে। তাঁহার সমাধির উপর এই কয়েকটি কথা লেখা আছে—"এখানে সার হেন্‌রি লরেন্স নিদ্রা যাইতেছেন, যিনি আপন কর্ত্তব্য সাধন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন।" কি হৃদয়গ্রাহী কথা! গৃহ সকল সেইরূপ ভগ্ন অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে। স্থানটি একটি উৎকৃষ্ট উদ্যানে পরিণত করা হইয়াছে। তাহার বৃক্ষ-চ্ছায়ায় কত বীর ও বীরাঙ্গনা নিদ্রা যাইতেছেন।

পত্রখানি এই পর্য্যন্ত লেখা হইবার পর, মহেন্দ্র বাবু বাড়ী ফিরিয়া আইসেন, এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া বাহির-হ[illegible]: সুতরাং আর লেখা হইল না। পর দিবস বিঠুর যাই, সায়াহ্নে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আবার কানপুরে ফিরিয়া আসি। কাল কানপুর হইতে রওনা হইয়া, এইমাত্র ১৯এ মে তারিখে ১টার সময়ে, হরিদ্বার পঁহুছিয়াছি। কাল রাত্রি হইতে আহার হয় নাই। এ দিকে আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানেও কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীর মেলা হইয়া থাকে। পথে ঘাটে ভারতবর্ষের নানাস্থানীয় কুসুমরাশি ফুটিয়া যেমন মন মোহিত করিতেছে, অন্যদিকে, বাড়ী ঘর সকল এত অপরিষ্কার করিয়াছে যে, এক মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে ইচ্ছা করিতেছে না। অতি কষ্টে, একটি বাড়ীর ত্রিতলে, একটি অষ্টকোণ পায়রার খোপ-বিশেষ কক্ষ পাইয়াছি। নিম্নে সুনীলা ক্ষীণ-কলেবরা মাতর্গঙ্গা, কুলু কুলু রবে বহিয়া যাইতেছেন, সংখ্যাতীত নরনারী তাহাতে অবগাহন করিতেছে। অপর পারে হিমাচল, নাট্যশালার যবনিকার মত শোভা পাইতেছেন। শরীর অবসন্ন, হৃদয়ও তোমাদের পত্র না পাইয়া ডুবিয়া রহিয়াছে; অতএব,

এইখানেই শেষ করিলাম। লাহোরে পঁহুছিয়া, লক্ষ্ণৌ, বিঠুর ও হরিদ্বারের বর্ণনা করিয়া, দীর্ঘ পত্র লিখিব।

লক্ষ্ণৌ।

২

আজ আবার লক্ষ্ণৌর কথা লিখিব। কিন্তু কি লিখিব? লক্ষ্ণৌ মুসলমানদের শোকসিন্ধু। রেসিডেন্সির কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। তাহার পার্শ্বেই কিঞ্চিৎ দূরে 'কেশরবাগ'। একটি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ কল্পনা কর। তাহার চারি পার্শ্বে সারি সারি দ্বিতল ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহশ্রেণী। স্থানে স্থানে গোল ও অন্যবিধ বারাণ্ডা বাহির হইয়াছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি অতি পরিপাটী একতল গৃহ। বিস্তৃত খিলানাবলীর উপর সুরঞ্জিত ছাদ, সারি সারি শোভা পাইতেছে। ইহার নাম 'বারদ্বারী'। ইহার চারি দিকে পুষ্পোদ্যান। এক দিকে ভগ্ন স্নানের 'হামাম', অন্য দিকে একটি জলপ্রণালী, তাহার উপর এক পোল। চারি দিকের অট্টালিকাতে শেখ নবাব ওয়াজিদ আলি সাহার ৩৫০ কি ৪০০ পত্নী থাকিতেন। তাহাদিগকে লইয়া, নবাব এই 'কেশরবাগে' রাস, দোল ইত্যাদি জীবন্ত লীলা করিতেন। ইহাতে স্ত্রীলোক ও নপুংসকগণ ভিন্ন আর কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। এক এক কক্ষে এক একটি অতুলনীয়া রূপসী। পৃথিবীর যত স্থান রমণীর পুষ্পোদ্যান বলিয়া খ্যাত, সর্ব্বত্র হইতে এ ফুল রাশি,

নবাব বাহাদুরের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য সঞ্চিত হইত। যখন 'কেশর-বাগের' পুষ্পোদ্যানে রমণীগণ প্রভাতে ও সায়াহ্নে বিচরণ করিতেন, মনে কর দেখি, তখন ফুলের সঙ্গে জীবন্ত ফুল মিশিয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই হইত। কিন্তু ইহাদের অনেকের সঙ্গে, পতি-প্রবরের জীবনে এক দিনও সাক্ষাৎ হইত কি না, সন্দেহ। আমি ২।৪টি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম। এক একটি কক্ষ, সম্মুখে একটুকু বারাণ্ডা। আমার কাছে স্থানটি বড় আরামের কি আয়েসের যোগ্য বোধ হইল না। এরূপ নরাধম ইন্দ্রিয়পরায়ণের রাজ্য থাকিবে কেন? ছলে কৌশলে বৃটিশ সিংহ বাহাদুর, গরিব নির্দ্দোষ ওয়াজিদ আলির রাজ্য কাড়িয়া লন। সিপাহিবিদ্রোহের ইহাও একটি প্রধান কারণ। যাহার উপর এরূপ অত্যাচার হইয়াছে, সিপাহিরা মনে করিয়াছিল, সে অবশ্য তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবে। বিদ্রোহের পর, ইংরাজ বাহাদুর, অযোধ্যার তালুকদারগণকে কেশরবাগ দিয়াছেন। তাঁহারা কেহ কেহ, স্থানে স্থানে গৃহটি সংস্কার করিতেছেন, এবং সামান্য পথিকগণকে ভাড়া দিতেছেন। হায় পার্থিব গৌরবের পরিণাম! অযোধ্যার দুর্দ্দান্ত নবাব-পত্নীদিগের বিলাস স্থলে আজ কি না পান্থনিবাস! এক দিক্ ভাঙ্গিয়া প্রকাণ্ড 'কেনিং কলেজ' স্থাপিত করা হইয়াছে। এক দিকে একটি অতি উচ্চ 'গেট' রহিয়াছে। ইহার নাম 'লক্ষ্মী-দরওয়াজা'। প্রস্তুত করিতে লাখ টাকা লাগিয়াছিল। তাই নাম 'লক্ষ্মী'। অনেক দরিদ্রের 'লক্ষ্মী'র মূল্য যে লাখ টাকারও অধিক। টাকায় ত তাহার মূল্য হইতে পারে না।

তাহার পর 'বড় ইমামবারা' দেখিতে যাই। এক পার্শ্বে

রুম দেশের অনুকরণে একটি প্রকাণ্ড গেট বা তোরণ। তাহার পর, ইমামবারার মূল তোরণ। তাহা পার হইয়া গেলে, এক প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। চারি দিকে সারি সারি কক্ষসমন্বিত প্রাচীর। এক পার্শ্বে একটি অতি প্রকাণ্ড, অতি সুন্দর মস্‌জিদ, মধ্যাহ্ন রবিকরে ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে। প্রাঙ্গণের সম্মুখে ইমামবারা। মধ্যে একটি বিস্তীর্ণ কক্ষ। পৃথিবীতে নাকি এত বড় কক্ষ আর নাই। তাহাতে ইমামবারা-নির্ম্মাতা জনৈক ভূতপূর্ব্ব নবাব সমাধিস্থ রহিয়াছেন। কক্ষের উপরে রক্তবর্ণ প্রস্তরের বারাণ্ডা চারিদিকে শোভা পাইতেছে। তাহাতে বসিয়া নবাব-পুর-বাসিনীগণ, নীচে যে কোরাণ পাঠ হইত, তাহা শুনিতেন। বারাণ্ডায় প্রবেশ করিবার দ্বার সকল এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, একটি গোলক-ধাঁধাঁ বলিলেও হয়। পথপ্রদর্শক এক জন সঙ্গে না থাকিলে, পথ খুঁজিয়া পাওয়া ভার। নবাব-রমণীগণ, এখানে নাকি নবাব-পতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেন। কথাটা ঠিক্! দিল্লী হইতে চুরি করিয়া, তাঁহারা এ রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। আর তাহা লুকাইয়া গিয়াছে। জগতের রাজত্ব ও সম্পদ্ মাত্রই এরূপ লুকাচুরি। এক জন চুরি করিয়া রাজ্য ও সম্পত্তির সৃষ্টি করে—যুদ্ধই বল, বাণিজ্যই বল, আর ওকালতিই বল,—তাহা দুই দিন পরে লুকাইয়া যায়। ইহার সুখ বা গৌরব যে স্থাপন করে, সে প্রকৃতই দয়ার পাত্র। মনুষ্যত্বই প্রকৃত সুখ। মানুষের সকলই যায়, মনুষ্যত্ব যায় না। অযোধ্যার রাজ্য নাই। বাল্মীকির কবিত্ব অমর! তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া, শত শত নরনারী প্রতিদিন মনুষ্যত্ব লাভ করিতেছে। কি কথায় কি কথা আনিয়া ফেলিলাম! মধ্য

কক্ষের দুই পার্শ্বে অষ্ট-কোণ-সমন্বিত আর দুইটি কক্ষ আছে। তিনটি কক্ষই বহুমূল্য ঝাড় ইত্যাদিতে সজ্জিত। ইহার কিঞ্চিৎ দূরেই ছোট ইমামবারা। এটিও ঠিক্ বড় ইমামবারার মত। তবে আকৃতিতে ছোট হইলেও, দেখিতে এবং কারুকার্য্যে এটি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। বড় ইমামবারার প্রাঙ্গণ মরুভূমির মত। একটি বৃক্ষচ্ছায়া, একটি ফুলের চারাও নাই। কিন্তু ইহার প্রাঙ্গণে একটি সুন্দর উদ্যান রচিত হওয়াতে, স্থানটি অতীব সুন্দর ও শান্তিপ্রদ বোধ হয়।

কেশরবাগের পার্শ্বেই 'ছত্র-মঞ্জিল'। একটি নহে, পাঁচটি গৃহ লইয়া ভূতপূর্ব্ব নবাবদিগের এই বাসস্থান নির্ম্মিত। প্রধান ভবনটির শীর্ষদেশে একটি স্বর্ণছত্র বিরাজিত। তাই ইহার নাম ছত্রমঞ্জিল। ধাতুনির্ম্মিত ছত্রটি এখনও শোভিত রহিয়াছে, নিম্নস্থ গোমতীর সলিলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। কিন্তু সেই ছত্রধর এখন কোথায়? তাঁহার রাজ্যের যে একটি ক্ষুদ্র ছায়া মেটিয়াবুরুজে ছিল, তাহা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। ছত্র-প্রাসাদের নিম্নতলের এক কক্ষ এখন সাধারণ পুস্তকালয়। ঊর্দ্ধতলের কক্ষ সকল শ্বেতপুরুষদের ক্লব-ভবন। অন্য একটি গৃহ এখন মিউজিয়ম—এ অঞ্চলের লোক বলে, 'আজায়ের ঘর'। আবার বলি, হায় পার্থিব সম্পদের ও গৌরবের পরিণাম!

তার পর, 'সাহা-নিজা' দেখিতে যাই। এটিও একটি প্রকাণ্ড সমাধিভবন। সিপাহিবিদ্রোহের সময়ে এখানে ঘোরতর যুদ্ধ হয় বলিয়া, এ স্থানটি এখন বিশেষ বিখ্যাত। এতদ্ভিন্ন, (বলা বাহুল্য) লক্ষ্ণৌতে ইংরাজদিগের পার্ক বা পঞ্চবটী উদ্যান আছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের বাড়ী আছে। পুরাতন রাজপ্রসাদ সকল

দেখিয়া আসিয়া, উহা দেখিতে ঠিক্ যেন একটি কপোতের বাসা বোধ হয়। ২।৪টি ইংরাজকে, যেথানে বিদ্রোহের সময়ে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহার উপর অবশ্য একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। আর, যে শত শত নিরপরাধদিগকে ইংরাজেরা হত্যা করিয়াছিলেন, এখন আর তাহার চিহ্নমাত্র নাই!

রুড়কি।

আজ প্রাতে হরিদ্বার হইতে ১২টার সময়ে রুড়কি পহুঁছি। ডাকবাঙ্গলাতে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া নগরদর্শনে যাই। এইমাত্র ষ্টেশনে আসিয়া, গাড়ীর ঘণ্টা খানিক বিলম্ব দেখিয়া, অপেক্ষাকক্ষে বসিয়া তোমাকে পত্র লিখিতে বসিলাম। চিরদিনই তোমাকে পত্রলেখা আমার পক্ষে এক আনন্দ! তথাপি এ দূর দেশ হইতে পত্র লিখিতে যে সুখ বোধ হয়, এমন সুখ বুঝি জগতে অল্পই আছে।

পূর্ব্বদৃষ্ট স্থান সকলের কথা এখন হাতে রাখিয়া, রুড়কিতে যাহা দেখিলাম, আজ তাহাই লিখিব। সলিলস্বরূপা গঙ্গা দেবীর শক্তি আমাদের পুণ্যশ্লোক পূর্ব্ব পুরুষেরা বুঝিয়াছিলেন। তাই সলিলশক্তির পূজা প্রচলিত করিয়াছেন। তাই বলিয়াছেন,—তাঁহার শক্তিপ্রভাবে ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাঁহারা সে শক্তি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। মাতার প্রকৃত পূজা আমরা শিখিলাম

না। গীতার কর্ম্মবাদ ঘুচিয়া, দেশে বেদান্তদর্শনের মায়াবাদ আসিল। সংসার কিছুই নহে, মায়ামাত্র। জীবন কিছুই নহে, নলিনীদলগত জলমাত্র। পড়িয়া গেলেই ভাল। এ শিক্ষাও মহৎ বটে; কিন্তু জ্ঞানের এক অঙ্গমাত্র। আমরা এই এক অঙ্গকে, এই অধ্যাত্মিক জ্ঞানকাণ্ডকে সর্ব্বস্ব ভাবিয়া, প্রকৃত কর্ম্মকাণ্ড ভুলিয়া গেলাম। আমরা তাই ডুবিলাম। পশ্চাত্য বিজ্ঞান বুঝিল, যে শক্তি ঐরাবতকে উড়াইতে পারে, তাহার দ্বারা কলের চাকা ঘুরাণ যাইতে পারে। ততোধিক দেখিলেন, দেশে জলাভাবে কৃষি হয় না, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; অথচ জীবনস্বরূপা ভাগীরথীর জলরাশি বহিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। যেখানে গঙ্গা প্রথম তাঁহার জন্মস্থান বা পিত্রালয় হিমাচল হইতে পদতলস্থ সমতল ভূমিতে পড়িয়াছেন, সেখানে গঙ্গার পার্শ্বে হরিদ্বারে গঙ্গা অপেক্ষা গভীরতর করিয়া খাল বা কেনেল কাটিয়া,—এ অঞ্চলে "নহর" বলে, কথাটা বোধ হয় লহর—গঙ্গার স্রোত ফিরাইয়া, জলশূন্য স্থানের মধ্যে বহুতর স্রোত বহাইয়া, শেষে কানপুরে নিয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আবার গঙ্গার পূর্ব্ব স্রোতে ফেলিলেন। ইহাতে অন্তরবর্ত্তী স্থানসমূহে স্বর্ণ ফলিতেছে। রুড়কিতে কেনেল আসিয়া সোলানী নদীর পার্শ্বে উপস্থিত। নদীর সঙ্গে মিশাইয়া দিলে খালের জলও নদীপথে বহিয়া যাইবে। বিজ্ঞান, অদ্ভুত কৌশলে, নদীর বক্ষে প্রায় ৩ মাইল ব্যাপী এক মহাসেতু নির্ম্মাণ করিয়া, সেতুর উপর দিয়া গঙ্গার লহর বা কেনেল বহাইয়া লইয়াছে। নীচে সোলানী নদী পূর্ব্ব-পশ্চিমে বহিয়া যাইতেছে। সেতুর উপর দিয়া লহর উত্তর দক্ষিণে বহিয়া যাইতেছে। বর্ষাকালে স্থানটির যে কি শোভা হয়, বলা যায় না। ঐরাবতও ভাসিয়া

গিয়াছিলেন। কিন্তু কেনেলের দুই পার্শ্বে দুই বিরাট সিংহমূর্ত্তি—ব্রিটিশদিগের জাতীয় চিহ্ন—ভ্রূকুটী করিয়া স্রোতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন, তাহা উপাখ্যান। ব্রিটিশ সিংহ যে এ অঞ্চলে গঙ্গা আনিয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম। ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল, মাতা এখন ব্রিটিশ সিংহের সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া প্রবাহিতা হইতেছেন। কেনেলের জলের বেগে, স্থানে স্থানে কল ঘুরিয়া ময়দা পিসিতেছে। এ সকলকে জলের কল বলে। তাই বলিতেছিলাম, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যথার্থ শাক্ত। তাহারাই শক্তির প্রকৃত পূজা করিতেছে। আমাদের পূজা কেবল পুতুলপূজাই বটে। আমরা সত্যই অন্তঃসারশূন্য পৌত্তলিক।

জল সিদ্ধ করিলে বাষ্প উঠে, জলপাত্রের মুখে আচ্ছাদন থাকিলে, তাহা ঢক ঢক করিয়া নড়িতে থাকে, একবার উঠে, একবার পড়ে—ইহা আবহমান কাল হইতে আমরা দেখিয়া আসিতেছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বুঝিল, এ ক্ষুদ্র শক্তিকেও বড় করিয়া মানবের বৃহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। জলপাত্রের আচ্ছাদন ঢক ঢক করিয়া নড়িতেছে দেখিয়া, জনৈক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক, বাষ্পের শক্তির প্রথম আবিষ্কার করেন। আজ তাহার উত্তরাধিকারীগণ, সেই বাষ্পের দ্বারা, বৃহৎ বৃহৎ কলের আচ্ছাদন নাড়িয়া, তদ্দ্বারা চক্রের পর চক্র ঘুরাইয়া, স্থলে শকট, জলে অর্ণবযান চালাইতেছেন। রুড়কিতে ইহা দ্বারা কর্ম্মকার ও সূত্রধরের কার্য্য করিতেছে। কলে লোহা গলিতেছে, গড়িতেছে, ছেঁচিতেছে, কাটিতেছে, এবং জগতের যাবদীয় লোহার বস্তু নির্ম্মাণ করিতেছে। আবার কলে কাঠ কাটিতেছে, রেঁদা

করিতেছে, এবং এইরূপে কাষ্ঠের নানাবিধ উপকরণ প্রস্তুত করিতেছে। কল-ঘর দেখিয়া, রুড়কির ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ দেখিতে যাই। মধ্যস্থলে একটি গোল কক্ষ, উপরে গুম্বজ, অতি-পরিপাটী, তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই গলির দুই সীমায়, আবার দুইটি ঈষৎ গোলাকার কক্ষ। অতি সুরঞ্জিত, ইঞ্জিনিয়ারিং চিত্রাদিতে সজ্জিত। বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারদিগের মূর্ত্তি প্রকোষ্ঠকেন্দ্রে, এবং চিত্র দেয়ালে, শোভিতেছে। গলির দুই পার্শ্বে, ক্লাসে ক্লাসে ছাত্রেরা বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। গৃহটি অতি সুন্দর। আর না। গাড়ী আসিতেছে। ভরসা করি, কাল লাহোর গিয়া তোমাদের পত্র পাইব। মন আকুল বলিয়া কোথাও তিষ্ঠিতে পারিতেছি না।

বিঠুর।

আজ বিঠুরের কথা লিখিব। বিঠুরে প্রথমে নানা সাহেবের বাড়ী দেখিতে যাই। ইংরাজেরা মহারাষ্ট্র জয় করিয়া, মহারাষ্ট্রপতি বাজি রাওকে বিঠুরে বন্দী করিয়া রাখেন। নানা ধুন্দুপন্থ বা নানা সাহেব, তাঁহারই পোষ্যপুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, ইংরাজ বাহাদুর তাঁহার বৃত্তির লাঘব করেন, এবং তাঁহার সহিত নানাবিধ অসদ্ব্যবহার করেন। আজিমুল্লা নামক একজন নীচবংশীয় মুসলমান যুবককে, ইংরাজ, নানার পুত্রের শিক্ষক

নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তি শীঘ্র নানার বিশ্বাসভাজন হয়। তাঁহার পক্ষে উকিল হইয়া বৃত্তি বাড়াইবার জন্যে, বিলাতে দরবার করিতে যায়। বহুতর অর্থব্যয় করিয়া, বিফল হইয়া, দেশে আসিয়া নানাকে বলে যে, ইংলণ্ড একটি ক্ষুদ্র স্থান মাত্র। সে শীঘ্র নানাকে ভারতবর্ষের সম্রাট করিয়া দিবে। এই পাপিষ্ঠই বিদ্রোহের প্রধান কারণ। তাহার দ্বারাই কানপুরে সেই সকল শোচনীয় হত্যাকাণ্ড হয়। নানা অতি ধর্ম্মাত্মা লোক ছিলেন, তিনি ইহার কিছুই জানিতেন না। বিদ্রোহের সময়ে, ইংরাজেরা নানার বাড়ী তোপে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার হাতার প্রাচীর এবং তোরণটি মাত্র এখন অবশিষ্ট আছে। দেখিলে, হৃদয়ে যুগপৎ শোক ও দয়ার উদয় হয়। মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে বহুতর মহারাষ্ট্র এ অঞ্চলে আসিয়াছিল। আজ তাহারা অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে।

তাহার পর, ধ্রুব-ঘাট দেখিতে যাই। প্রবাদ, এখানে ধ্রুব তপস্যা করিয়াছিলেন। পার্শ্বে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিধৌত করিয়া, গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। এখান হইতে ঘাটের সারি লাগিয়াছে। কার্ত্তিকপৌর্ণমাসীর মেলা উপলক্ষে, অদ্য গঙ্গাসলিল-বিধৌত কামিনীকুসুমরাশির অতুলনীয় শোভা। ব্রহ্মাবর্ত্তের ঘাটে যাই। এখানে একটি লোহার শলাকা প্রস্তর-গ্রথিত রহিয়াছে। ইহাকে ব্রহ্মাবর্ত্তের খুঁটা বলে। আর্য্যগণ প্রথম যখন ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, বোধ হয়, এই পর্য্যন্তই ব্রহ্মাবর্ত্তের সীমা ছিল। তাহার পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্ত। শেষ যে ঘাটে লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা জানকীকে বনবাসে রাখিয়া চলিয়া যান, যেথানে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাকে পাইয়া

আশ্রমে লইয়া যান, সেই ঘাট দেখি। স্থানটি দেখিবামাত্র—যদিও দেখিবার কিছুই নাই, একটি সামান্য ঘাটমাত্র—স্মৃতির উচ্ছ্বাসে আমার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার পর, জগতের কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম। কবিতার জন্মস্থান, মহাকাব্যের জন্মস্থান, ভারতের অতুলনীয় রামায়ণের জন্মস্থান, রাম-সীতার যে চরিত্রবলে তাঁহারা চিরদিন দেবদেবীস্বরূপ পূজিত, সেই চরিত্রের জন্মস্থান দেখিয়া, যে ভক্তি ও শান্তির উদ্রেক হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। স্থানটি এখন কথঞ্চিৎ অরণ্য, পিলোয়া বৃক্ষে ও তেঁতুল ইত্যাদিতে সমাচ্ছন্ন। গঙ্গার তরঙ্গাভিঘাতে বালুকাস্তর স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াছে। প্রবাদ, এইরূপ একটি ক্ষুদ্র বালুকাস্তূপে, মহর্ষির আশ্রম কুটীর ছিল। এরূপ পবিত্র স্থানে কোথায় একটি দেবতুল্য মহর্ষিমূর্ত্তি দেখিব, না নিকৃষ্ট লিঙ্গ-উপাসকেরা এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া, তাহার উপর এক সামান্য মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। পার্শ্বে যেখানে সীতাদেবীর কুটীর ছিল, সেখানে একটি অতিকদর্য্য মূর্ত্তি আছে। কিঞ্চিৎ দূরে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকগৃহে তাঁহার এবং রামচন্দ্রাদির মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। সীতাদেবীর শ্বেতপ্রস্তরের মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। পবিত্র আশ্রমমূল প্রক্ষালিত করিয়া, এখানে শৈল-সুতা প্রবাহিতা হইতেছেন। বাল্মীকি যদি ইংরাজদের কেহ হইতেন, তবে আজ আমরা এখানে বাল্মীকির মূর্ত্তিসমন্বিত একটি প্রকৃত আশ্রম দেখিতাম, এবং পদে পদে কালিদাসের আশ্রমের বর্ণনা মনে পড়িত। বাল্মীকির দুর্ভাগ্য, তিনি আমা-দের বাল্মীকি। তথাপি দ্বারভাঙ্গার মহারাজার তাঁহার প্রতি

কিঞ্চিৎ কৃপা কটাক্ষ পড়িয়াছে। তিনি তালার উপর তালা তুলিয়া, একটি কবুতরের বাসার মত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। পার্শ্বে একটু পুষ্পোদ্যানও দেখিলাম। গৃহটি দেখিয়া আমার বোধ হইল যে, মহারাজের উদ্দেশ্য যে, উহাঁর চূড়া দূর হইতে দেখা যাইবে, এবং তদ্দারা বাল্মীকির না হউক, তাঁহার নাম ঘোষিত হইবে। বাল্মীকি এক অমর অদ্বিতীয় মহাকাব্য লিখিয়াও, কোথাও আপনার নাম সন্নিবেশিত করেন নাই। আর মহারাজ যে তাঁহার আশ্রমে সামান্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাহাতেও সর্ব্বাগ্রে নামের জন্যে লালায়িত। হায় রে আমাদের দুর্গতি!

এ অবধি যত স্থান দেখিয়াছি, কোনও স্থান তোমাকে দেখাইতে ইচ্ছা হয় নাই। কেবল মহর্ষির পবিত্র আশ্রমে দাঁড়াইয়া, জাহ্নবীর দিকে চাহিয়া মনে হইল, তুমি সঙ্গে থাকিলে কত সুখ হইত! অথচ, এ পুণ্য তীর্থটি কোনও বিদেশীয় যাত্রিক দর্শন করে না। এ দিকে ভারতবর্ষে এমন ঘর নাই, যেখানে রামায়ণ নাই, যেখানে রামসীতার পূজা নাই। কয় জনে বুঝে, এ পূজা বাল্মীকির অদ্ভুত প্রতিভার? মহর্ষির কৃপা ভিন্ন আজ রাম-সীতাকে কে চিনিত?

লাহোর।

তোমার পত্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া আমি হরিদ্বার কি রুড়কিতে তিষ্ঠি নাই। ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া আজ প্রাতে লাহোরে পৌঁছিয়াছি।

লাহোরে প্রথম মিউজিয়ম দেখি। বিশেষ কিছু বলিবার নাই। সম্মুখে বিখ্যাত ঝমঝম তোপ। হিন্দু ও শিখদিগের সময়ের এইটি সাম্রাজ্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। ইংরেজদের সঙ্গে চিলেনওয়ালার যুদ্ধেও শিখেরা এই প্রকাণ্ড তোপ ব্যবহার করিয়াছিল। তোপটি পিতলের, দেখিতে অতি সুন্দর। তাহার পর সার জন লরেন্সের প্রস্তরের মূর্ত্তি। ইহাকে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের ত্রাণকর্ত্তা বলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে, ইনি পঞ্জাবের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার নির্ভীকতা ও বুদ্ধিপ্রভাবে, পঞ্জাব বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই। তাহাতেই কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধৃত হয়, শিখদের দ্বারা সিপাহিরা পরাভূত হয়। তাঁহার এক হস্তে কলম, অন্য হস্তে তরবার, বীরভাবে দণ্ডায়মান।

তাহার পর, "সালেমার বাগ" দেখিতে যাই। সম্রাট সাহা-জাহান এক দিন স্বপ্নে স্বর্গ দেখেন। এ তোমার আমার স্বপ্ন নহে, সম্রাটের স্বপ্ন, তাহা বিফল হইতে পারে না। সেই স্বপ্নদৃষ্ট স্বর্গ সৃষ্টি করিবার জন্য আদেশ প্রচারিত হইল। মুসলমানদের স্বর্গ সপ্তস্তরবিশিষ্ট। তদনুসারে সপ্ত স্তরে সজ্জিত "সালেমার" উদ্যান প্রস্তুত হইল। ইংরাজ বাহাদুর ঘোরতর পার্থিব সুখপরা-

য়ণ। অতএব স্বর্গের উপরের সিঁড়ী চারি স্তর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, নিম্নের তিনটি স্তরমাত্র রক্ষা করিয়াছেন। মরি! মরি! কি কল্পনা! কি দৃশ্য! স্তরে স্তরে এই তিন স্তর মাটির ভিতর নামিয়াছে। প্রথম স্তরে 'গেট' পার হইলে, তাজমহলের সম্মুখে যেরূপ জল-প্রণালী আছে, সেইরূপ। তাহার দুই পার্শ্বে রাস্তা, রাস্তার দুই দিকে সুফল বৃক্ষের উপবন। তাহার পর একটি সুন্দর বসিবার ঘর, সম্মুখে একটি কৃত্রিম সরোবর। মধ্যস্থলে একটি বসিবার স্থান, অতি সুন্দর। সরোবরের দুই পার্শ্বে উপবন। তৃতীয় স্তরে আবার জলপ্রণালী ও উপবন। প্রণালীতে ও সরোবরে, সর্ব্বত্র, সংখ্যাতীত ফোয়ারা খেলিতেছে। স্থানটি কি সুশীতল ও শান্তিপ্রদ!

পর দিবস "সাহাদরা" দেখিতে যাই। এটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধিগৃহ। শুনিলাম, নুরজাহান ইহা পতিভক্তির নিদর্শনস্বরূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। গৃহটি দেখিতে যেন একটি অতি প্রকাণ্ড বৈঠকখানা বাড়ী। কোথাও মুসলমানের সমাধির গুম্বেজ নাই। চারি কোণে বহুতল কক্ষবিশিষ্ট, চারিটি উচ্চ স্তম্ভ। তুমি তাজমহলে এরূপ দেখিয়াছ। তাহার উপর হইতে দূরস্থ লাহোরের ও নিম্নস্থ রাবীনদীর শোভা দেখিতে অতি মনোহর। ফিরিয়া আসিবার সময়, কয়েকটি মসজিদ ও রণজিৎ সিংহের—যাঁহাকে ইংরাজেরা পঞ্জাবের সিংহ বলেন,—সমাধি দেখিলাম। এটি গৌরবের সমাধি বলিলেও হয়। এই সিংহের ঘরে, হা বিধাতঃ! কি কেবল শৃগাল জন্মিল? তাঁহার শেষটি আজ রুষিয়াতে ভিক্ষা করিয়া জীবনযাপন করিতেছেন।

তাহার পর লাহোরের দুর্গ দেখিলাম। যে সকল গৃহে

রণজিৎ থাকিতেন, তাঁহার সেই প্রিয় শিখ-মহল এখনও বর্ত্ত-মান। তুমি হাজারি-আয়না দেখিয়াছ। মনে কর, কতকগুলি কক্ষের ভিতরের প্রাচীর ও ছাদ, সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়নার দ্বারা খচিত। একটি গৃহে শিখদিগের নানাবিধ অস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে। তাহাদের বর্ম্ম বা বক্ষস্ত্রাণ ও পৃষ্ঠত্রাণ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এ গুলি ধাতুময় এবং ওজনে এক একটি ২০।৩০ সেরের কম হইবে না। এই ভার অলঙ্কারের স্বরূপ ব্যবহার করিয়া, যাহারা সেই বিস্ময়কর যুদ্ধ সকল করিয়াছিল, জানি না, তাহারা কি অসাধারণশক্তিসম্পন্ন লোকই ছিল! তাহারা কত প্রকারের অস্ত্র, বন্দুক ও তোপই প্রস্তুত করিয়াছিল! আমার চক্ষে জল আসিল, আর মনে হইল,—'যুবরাজ! আজি সে জাতি কোথায়?'

লিখিতে ভুলিয়াছি যে, জাহাঙ্গীরের সমাধি দেখিয়া আসি-বার সময়ে, তাঁহার প্রিয়তমা মেহের-উন্-নেসা (অর্থ, স্ত্রীজাতির চন্দ্র) বা নুরজাহান (অর্থ, পৃথিবীর আলোক) সুন্দরীর সমাধি দেখিয়া আসি। তুমি জান, নুরজাহান তখন ভারতবর্ষের অদ্বিতীয়া সুন্দরী ও অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্না রমণী বলিয়া, তাঁহার স্বামী সের আফগানকে বধ করিয়া, জাহাঙ্গীর তাহাকে বিবাহ করেন। একটি গল্প শুনিলাম। এক জন কবি তাঁহাকে দেখিবার জন্য, বহুদূর হইতে আসিয়া, রাজপথের পার্শ্বে দাঁড়া-ইয়া আছে। যখন তাঁহার গাড়ী চলিয়া যায়, সে বলিয়া উঠিল,—

খোল আবরণ, বহু দূর হ'তে
এসেছি দেখিতে মুখ।

নুরজাহান উত্তর করিলেন, তাঁও কবিতায়,--

খুলিলে, ভূতলে উদিবে চন্দ্রমা,
তারাগণ পাবে দুখ।

এ হেন রমণীরত্নের সমাধিটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া মনে যে কি কষ্ট হইল, বলিতে পারি না। উপরের কবর পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নিম্নের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রাবীর বন্যাস্রোত প্রবেশ করিয়া, সেখান হইতেও কবরের চিহ্ন পর্য্যন্ত ধুইয়া লইয়া গিয়াছে। বঙ্কিমবাবু যথার্থই নুরজাহানের মুখে বলিয়াছেন, 'এ রূপের ছাঁচ কবরের মাটীতে থাকিবে।' সেই রূপের, সেই প্রতিভার চিহ্ন বহুদিন লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু, অবস্থার ঘূর্ণচক্রে পড়িয়া, এই ভুবনমোহিনী যে পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, রাবীরও সাধ্য নাই যে, তাহা ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলে।

অমৃতসর।

তোমাকে অমৃতসরের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। লাহোর হইতে দিল্লী আসিবার সময়ে, পথে অমৃতসর দর্শন করি। প্রতুল, তাঁহার একজন মুন্সীকে আমার সঙ্গে দিয়াছিলেন। আমার গাড়ীস্থিত জনৈক পঞ্জাবী যুবক,—পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যা-লয়ের একজন বি-এ,—উক্ত মুন্সীর কাছে আমার কথা শুনিয়া, বড় আগ্রহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করে। তাহার নাম হরিচন্দ। তাহার পিতা ডেপুটী কালেক্টর, ভ্রাতা অমৃত-সরের তহশিলদার, সে নিজেও এবার ডিপুটী-কালেক্টরী পরীক্ষা

দিয়াছে। প্রতুলের বাসায় ঠিক যেন আমি কলিকাতায় ছিলাম। বাঙ্গলা কথা, বাঙ্গালী আহার, বাঙ্গালী ব্যবহার। আমি প্রতুলকে বলিতাম যে, ইহার জন্ত আমার পাঞ্জাব আসিয়া কি ফল? কিন্তু প্রতুল-ভায়ার সময় নাই যে, আমাকে কোনও পঞ্জাবীর বাড়ী লইয়া গিয়া, পঞ্জাবের আচার ব্যবহার দেখান। অতএব, এ যুবকের সহিত আমিও আগ্রহের সহিত আলাপ করিলাম। ফল এই হইল, অমৃতসরে গাড়ী পঁহুছিবার পূর্ব্বেই, সে আমাকে পাইয়া বসিল। সে আমাকে সঙ্গে করিয়া, সমস্ত অমৃতসর দর্শন করায়, এবং তাহার বাড়ীতে আহার করায় ;— সে আহারে বেশ নূতনত্ব আছে। গোলাকার এক চৌকির উপর বসিলাম, এবং গোলাকার আর এক চৌকিতে রুটী, ডাল, তরকারী এবং মাংস প্রভৃতি আহারীয় সামগ্রী প্রদত্ত হইল। আমি বড় আনন্দে খাইলাম। লোকটি এত ভালবাসা জানাইল যে, গাড়ী ছাড়িবার সময়েও আমার হাত তাহার হাতে গাঁথা ছিল। অথচ, এ দিকের বাঙ্গালীরা বলেন যে, এ দেশস্থ লোকেরা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করে; তাই তাঁহারা তাহাদের সঙ্গে মিশেন না।

অমৃতসরে প্রথমে বিখ্যাত স্বুবর্ণ-মন্দির দেখিতে যাই। ইহাকে শিখেরা "দরবার সাহেব" বলে। তুমি বেহারের "পাত্ত পুরীর" দৃশুটি স্মরণ কর। একটি বৃহৎ সরোবর। ইহারই নাম অমৃতসর। তাহার চারি তীরে, সারি সারি দ্বিতল ও ত্রিতল অট্টালিকা। শুনিলাম, একটিতে রোগী ভিন্ন আর কেহ প্রবেশ করিতে পারে না; এখানে, রোগী ধন্না দিলেই রোগ আরোগ্য হয়।

অমৃতসরোবরের মধ্যস্থলে সলিল-গর্ভে স্বুবর্ণ-মন্দির, চতুর্থ শিখগুরু রামদাস কর্ত্তৃক ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটি অনতিবৃহৎ হইলেও, সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। উহার স্বুবর্ণে সমাচ্ছন্ন দেহ ও উচ্চ গুম্বেজ, মধ্যাহ্নরবিকরে প্রদীপ্ত অগ্নিবৎ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছিল। অন্তর্ভাগও স্বুবর্ণ কারুকার্য্যে এবং স্থানে স্থানে মূল্যবান্ পান্না, মরকত, হীরক ইত্যাদি দ্বারা খচিত। স্তম্ভসারি দ্বারা শোভিত মধ্যকক্ষে, গুরুগোবিন্দের রচিত গ্রন্থদ্বয় বহুমূল্য আবরণে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, এবং বহুমূল্য চামরে উভয় পার্শ্ব হইতে ব্যজনিত হইতেছে। এক দিকে বসিয়া দুই জন গায়ক গাহিতেছে। যাত্রী নর-নারী কক্ষের চারি দিক প্রদক্ষিণ করিতেছে। দ্বিতল গৃহে, গুরুগোবিন্দের যোদ্ধৃবেশে অশ্বারূঢ় একটি চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। সেখানে রণজিৎ সিংহেরও একটি চিত্র আছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে, গুরু নানকের একটি মূর্ত্তি স্বর্ণে খোদিত রহিয়াছে। এক দিকে মর্ম্মর সেতুর দ্বারা মন্দিরটি সরোবরের তীরের সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে। শুনিলাম, জাহাঙ্গীর ও তাঁহার অদ্বিতীয়া রূপসী পত্নী নুরজাহানের সমাধি ও সালেমার উদ্যান হইতে বহুমূল্য মর্ম্মর ও রত্ন ইত্যাদি আনীত হইয়া, এই মন্দির নির্ম্মিত ও সজ্জিত হইয়াছিল। নুরজাহানের সমাধির বর্ত্তমান দুরবস্থার ইহাই প্রধান কারণ। শুনিয়া আমি দীর্ঘনিশ্বাস সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই ধার্ম্মিক ও বীরপুরুষেরা, কিরূপে যে এতাদৃশ হৃদয়হীন কার্য্য করিয়াছিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না।

শিখদিগের ধর্ম্মের স্রষ্টা নানক। ইনিই ইহাদের প্রথম গুরু।

গুরু গোবিন্দ দ্বিতীয় গুরু। ইনি ঘোরতর যোদ্ধা ছিলেন। নানক-প্রচারিত ধর্ম্মে ও গীতোক্ত ধর্ম্মে, আমি বড় প্রভেদ দেখিলাম না। শিখেরা জাতিভেদ মানে না, আহারসম্বন্ধে কোনও রূপ ধরা-বাঁধা নাই। তাহারা কোনও ধর্ম্মের বিদ্বেষী নহে, একমাত্র নারায়ণের উপাসনা করে, এবং গ্রন্থ দু'খানির পূজা করে। আমার ধারণা হইয়াছে যে, গুরু নানক, বিলুপ্ত গীতোক্ত ধর্ম্মই প্রচার করেন। নানক শিখদিগের কৃষ্ণ, রণজিৎ সিংহ অর্জ্জুন, এবং "যুদ্ধস্ব বিগত জ্বর"ই ইঁহাদের মূল মন্ত্র। এই মন্ত্র সাধিয়া, ধর্ম্মবলে কর্ম্মকে বলবান করিয়া, অমিতপরাক্রমে ইঁহারা পঞ্জাবে মোগলসাম্রাজ্যের বক্ষের উপর, শিখরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং এই মন্ত্রবলেই, শিখেরা ভারতীয় ইতিহাসে, অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

মন্দিরদর্শনের পর, আমি 'গোবিন্দগড়' দুর্গ দেখিতে যাই। এই দুর্গ রণজিৎ সিংহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার দুর্গের মত, ইহা দেখিতে একটি প্রসারিত-দল পদ্মের মত। তাহার পর নগর দর্শন করি। অমৃত-সর নগরও রণজিৎ কর্ত্তৃক স্থাপিত, দেখিতে অতি সুন্দর। একটি দোকানে গিয়া, কিরূপে শাল প্রস্তুত হয়, তাহা দেখিলাম। স্বতন্ত্র স্থানে আলোয়ান প্রস্তুত হয়। সেই আলোয়ানের উপর, এই সকল দোকানে কারুকার্য্য করা হয়। এক এক বর্ণের সুতা, এক এক জন কারীকরের হাতে। এক জন কারীকর, একখানি শালের ফুলের সর্ব্বত্রে কাল সূতার কার্য্য করিতেছে, আর এক জন তাহাতে লাল সূতার কার্য্য করিতেছে। সূচের দ্বারা কি সূক্ষ্মভাবে এবং কি পরিশ্রমের সহিতই কার্য্য করিতে হয়। একখানি 'দোরোখা

শাল’ দেখিলাম। ইহার দুই পিঠেই রোখ। আমি এরূপ শাল দেখি নাই। মূল্য ২০০৲ টাকা বলিল। এরূপ এক জোড়া শাল লইতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইল। কারীকরদের বেতন ৭৲। ৮৲ টাকা হইতে ২০৲ পর্য্যন্ত।

তাহার পর, অমৃতসরের উদ্যান এবং প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের জন্য যে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া, অমৃতসর দর্শন শেষ করিলাম। আমি এখানে ৬।৭ ঘণ্টামাত্র ছিলাম।

ইন্দ্রপ্রস্থ

দিল্লীর কথা তোমাকে আমি আর নূতন করিয়া কি লিখিব? “বিশপ হিবার” হইতে “নীহারিকা”-রচয়িত্রী পর্য্যন্ত, যিনি দিল্লী আগ্রা দেখিয়াছেন, তিনিই তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তুমিও তাহা অনেক বার পড়িয়াছ। অতএব, দিল্লীর কথা আমি আর নূতন করিয়া কি লিখিব? দিল্লী, হিন্দু-সাম্রাজ্যের মহাশ্মশান, মুসলমান সাম্রাজ্যের মহা সমাধি, মহাকালের মহা রঙ্গভূমি। শ্মশানের ছাই উড়িয়া গিয়াছে, যমুনার পবিত্রজলে প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে। সমাধির প্রস্তররাশিতে দিল্লী আজ সমাচ্ছন্ন। বর্ত্তমান দিল্লী হইতে পুরাতন দিল্লী পর্য্যন্ত পঞ্চ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া, কেবল সমাধির পর সমাধি, তাহার পর সমাধি। যে দিকে চাহিবে, দেখিতে পাইবে—“ঘোরারাবী, মহারৌদ্রী, শ্মশানালয়বাসিনী,” ধ্বংসরূপিণী,—মহাকালী, দিগম্বরীবেশে

নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন। ধ্বংসগত সাম্রাজ্য সকলের ভস্মের নীরবতার মধ্য হইতে যেন জননীর ঘোর অট্টহাস্য ভাসিয়া উঠিতেছে। দিল্লীতে পা দিয়াই আমার সেই বাইরণের মহাকাব্য স্মরণ হইল;—

"দাঁড়াও! চরণ তব সাম্রাজ্য ধূলায়।

"দুইটি সাম্রাজ্য নীচে রয়েছে প্রোথিত!"

দিল্লী যত দেখিতে লাগিলাম, তত অন্য একজন কবির আক্ষেপ মনে পড়িল,—

"বীরত্বের গর্ব্ব আর প্রভুত্ব বিভব,
"সম্পদ সংসার সব যাহা করে দান,
অলঙ্ঘ্য মৃত্যুর হায়! মুখাপেক্ষী সব,
"গৌরবের পথ মাত্র মৃত্যুর সোপান।"

সর্ব্ব প্রথম হিন্দুর শ্মশানের কথা বলিব, কারণ, হিন্দু সাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। হিন্দু সাম্রাজ্য, ভগবান্ কৃষ্ণের কীর্ত্তি,—যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য,—উপন্যাসের কথা নহে, কাব্যকারের সৃষ্টি নহে। ইন্দ্রপ্রস্থের রাশি রাশি ভগ্নাবশেষ, স্তুপাকারে, বর্ত্তমান দিল্লীর এক ক্রোশ দক্ষিণে এখনও বর্ত্তমান আছে। লোকেরা ইহাকে এখনও ইন্দ্রপাট বলে। যুধিষ্ঠিরের রাজপুরীর দুর্গ এখনও বর্ত্তমান আছে। বলা বাহুল্য, কালে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। প্রথম যবন সম্রাটেরা ইহার সংস্কার করেন। দুর্গের এক কোণে ভগ্ন রাজপুরীর প্রস্তররাশিতে নির্ম্মিত, এক উচ্চ মসজিদ এবং তাহার পার্শ্বে আর একটি অতি সুন্দর, গোল, ত্রিতলকক্ষ-সমন্বিত, স্বল্পায়তন গৃহমাত্র বর্ত্তমান আছে। হিন্দু রাজপুরীর প্রস্তরে নির্ম্মিত মুসলমান রাজপুরীও আবার কালে ধ্বংস হইয়া

গিয়াছে। দ্বিতীয় গৃহের ত্রিতল কক্ষে বসিয়া, যমুনার শীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে, প্রথম মোগল সম্রাট হুমায়ুন অধ্যয়ন করিতেন। ইহার তৃতীয় সোপান হইতে পড়িয়া, তাঁহার অপমৃত্যু হয়। মোগল রাজ্য, তাঁহার পুত্র, প্রাতঃস্মরণীয় আকবর আগ্রায় তুলিয়া লইয়া যান। ইন্দ্রপ্রস্থের দ্বিতীয়বার কপাল ভাঙ্গিল। ইদানীং ইহাতে একটি গ্রাম বসিয়াছে। বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকগৃহও নির্ম্মিত হইয়াছে। যেখানে সেই বিচিত্র রাজপুরী, সেই অতুলীয়, ময়দানবের নির্ম্মিত সভাগৃহ ছিল, আজ সেখানে দরিদ্রের কুটীরসমূহ বিরাজ করিতেছে। ভগবানের সেই অমানুষিক লীলার কেন্দ্রস্থান ইন্দ্রপ্রস্থের এই দশা! মসজিদের ছাদের প্রস্তরে বক্ষ রাখিয়া, পুরাতন দুর্গের প্রাচীর দেখিয়া দেখিয়া, শোকের ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমি কাঁদিলাম। হয় ত, এ স্থানে এখনও সেই নরোত্তমের পদধূলি পড়িয়া আছে,—প্রহ্লাদের মত তাহা অঙ্গে মাখিয়া, এই অকিঞ্চিৎকর মানবজীবন সার্থক করি। সকলই গিয়াছে, কেবল এখনও দুর্গের পদমূল ভক্তিভরে প্রক্ষালন করিয়া, যমুনা দেবী শোকে নীরবে বহিয়া যাইতেছেন। আজ এই পর্য্যন্ত।

পুরাতন দিল্লী।

ইন্দ্রপ্রস্থের কথা লিখিয়াছি। যে অমানুষিক প্রতিভাবলে ভারতে মহাভারত স্থাপিত হইয়াছিল, প্রভাসতীরে অকালে তাহার তিরোধান হইলে, সেই ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তি এরূপ দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মে

স্থাপিত হইয়াছিল যে, তাহা কিছু কালের জন্তে কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইলেও, বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া স্থায়ী হইয়া, ভারতে সুখ ও শান্তির বিধান করিয়াছিল। কালে গীতার ধর্ম্ম লুপ্ত হইল। অনন্তজ্ঞান-সম্পন্ন শাস্ত্রকারদের জ্ঞানান্ধ উত্তরাধিকারীগণ, ভারতের শক্তি জাতিভেদ-শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে বাঁধিলেন। ধর্ম্ম কেবল যাগযজ্ঞে এবং নরহত্যা ও জীবহত্যায় পরিণত হইল। আবার সেই অবস্থা,—

"যখন যখন ঘটে ভারত! ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি।
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের
করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি যুগে যুগে
জনম-গ্রহণ।"

আবার ভগবান জন্মগ্রহণ করিলেন। ভগবান বুদ্ধদেব এক ফুৎকারে জাতিবন্ধন উড়াইয়া দিয়া, সাম্যগীতে ভারত প্লাবিয়া, গীতার কর্ম্মবাদ ঘোষণা করিলেন। ভারত নবজীবন পাইয়া নাচিয়া উঠিল। আবার অশোকের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইল। অসংখ্য শৈলস্তম্ভ, বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতি বক্ষে ধারণ করিয়া, ভারত ব্যাপিয়া, ধর্ম্মরাজ্য ঘোষণা করিল। কিন্তু জগতের পরিবর্ত্তননীতি অলঙ্ঘ্য। উন্নতি না হইলে অবনতি হইবে। জগৎ স্থির থাকিতে পারে না। আবার জ্ঞানান্ধ বৌদ্ধ যাজকের হস্তে পড়িয়া, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অন্তঃসারশূন্য হইল। ভগবান আবার জন্মগ্রহণ করিলেন। শঙ্করাচার্য্য, অদ্বৈত শৈববাদে ভারত মাতাইয়া তুলিলেন। ভারতে তৃতীয় বার ধর্ম্মসাম্রাজ্য স্থাপিত হইতে চলিল। চৌহান

পৃথ্বীরাজ ইহার শক্তি। ইন্দ্রপ্রস্থের চারি ক্রোশ উত্তরে, যমুনা-তীরে, তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। তাহারই নাম দিল্লী। পৃথ্বীরাজের দুর্গের প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ বা কুতুব মিনার, এখনও বর্ত্তমান আছে। নূতন দিল্লীর বহির্ভাগে, এখনও তাঁহার নীতিস্তম্ভ দুইটি বিরাজ করিতেছে। পুরাতত্ত্ববিৎ ইংরাজ বলেন, কুতুব মিনার কুতুবুদ্দিনের নির্ম্মিত। মোল্লাগণ ইহার সানুদেশে দাঁড়াইয়া, "আজাহার" দিবে বলিয়া, নির্ম্মিত হইয়াছিল। হিন্দুরা বলেন, পৃথ্বীরাজের কন্যা যমুনা দর্শন করিবেন বলিয়া, এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুইটি প্রবাদের কোনটিই ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। এই পর্ব্বতবৎ উচ্চ স্তম্ভে উঠিলে, কথা কহিবার শক্তি থাকে না। অতএব, মোল্লা সাহেবগণ এত সোপান বাহিয়া উঠিয়া যে আজাহার দিতে পারিতেন, এমন বোধ হয় না। বিশেষতঃ, পার্শ্বস্থিত বিপুল কারুকার্য্যখচিত, বিচিত্র, অতুলনীয় হিন্দু দেবালয় ভগ্ন করিয়া, যে মসজিদ নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহা শেষ হয় নাই। মসজিদের পূর্ব্বে আজাহারের স্থান নির্ম্মিত হওয়া সম্ভবপর নহে। অন্য দিকে, অনতিপরিস্ফুটিতা, কুসুমকোমলা, পৃথ্বীরাজ-দুহিতা যমুনাদর্শনের যে জন্য এত সোপান বাহিয়া উঠিতেন, তাহাও সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আমার বোধ হয়, চিতোরে যেরূপ কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে, ইহাও সেইরূপ কোনও বিরাট যুদ্ধের শেষে, পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালে ইহা জীর্ণ হইলে, কুতুবুদ্দিন ইহা সংস্কৃত এবং আরবী অক্ষরে শোভিত করেন। আমার অনুমানের প্রধান কারণ এই যে, চিতোরের স্তম্ভ ও এই স্তম্ভটি, ঠিক একরূপ।

বলিয়াছি, পৃথ্বীরাজের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইতেছিল, কিন্তু হইল না। মহম্মদীয় ধর্ম্মের বৈজয়ন্তী উড়াইয়া, মুসলমান দিগ্বিজয়ীরা ঘন ঘন ভারতের দ্বারে হানা দিতে লাগিলেন; অন্যূন দশ বার, পৃথ্বীরাজের বাহুবলে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু হায়! হায়! এমন সময়ে ভারতের চিরকলঙ্ক, চিরসর্ব্বনাশের কারণ অন্তর-বিরোধানল জ্বলিয়া উঠিল। পৃথ্বী-শ্রীকাতর, কুলাঙ্গার, কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্র, মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যোগ দিল। বীরকুলোত্তম পৃথ্বীরাজ রণক্ষেত্রে পতিত হই-লেন। ভারতের কপাল বুঝি চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিল; ভারতের শেষ সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল।

বৰ্ত্তমান দিল্লী।

পূর্ব্বে তোমাকে যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ এবং পৃথ্বীরাজের দিল্লীর কথা লিখিয়াছি। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাচীর, বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের একটিমাত্র লৌহ স্তম্ভ, এবং পৃথ্বীরাজের "পিথোরা"-দুর্গের ভগ্না-বশেষমাত্র বর্ত্তমান আছে। ভারতের বক্ষের উপর দিয়া, এমনই সর্ব্বধ্বংসী বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বকৃত দেবালয়ের প্রাঙ্গণে যে লৌহস্তম্ভটি আছে, লোকে তাহাকে "ভীমের গদা" বলিত। প্রবাদ, কোনও রাজা তাহার মূল দেখিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে স্তম্ভ হইতে রক্ত উঠে এবং স্তম্ভ "ঢিলা" হইয়া যায়। "ঢিল্লী" হইতে "দিল্লী" নাম হইয়াছে। কিন্তু স্তম্ভের অঙ্গে যে লিপি খোদিত আছে, তাহা এখন পুরাতত্ত্ববিৎগণ পড়িয়াছেন।

তাহাতে লেখা আছে, রাজা "ধ্রুব" কর্ত্তৃক, ১,৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ, ইনি বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। দিল্লীর উপর দিয়া এমন বিপ্লব গিয়াছে যে, এ ঘটনাটি পর্য্যন্ত দিল্লীর পরবর্ত্তী অধিবাসীগণ কেহ জানিত না।

পৃথ্বীরাজের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। কুতুবুদ্দিন প্রভৃতি প্রথম পাঠান সম্রাটেরা, পৃথ্বীরাজের দিল্লীতে রাজধানী রাখেন। এই ঐতিহাসিক মহাশ্মশানে, ঈশ্বরের নৈতিক রাজ্যের প্রমাণ, সর্ব্বত্রে বিরাজমান রহিয়াছে। আলাউদ্দিনের পদ্মিনী-উপাখ্যান এবং চিতোরধ্বংস শ্রবণ কর। আর এখানে দেখ, সেই আলাউদ্দিন যে প্রকাণ্ড হিন্দু দেবালয় ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহার রাজবাটী ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আফগান রাজ্যের জনৈক অধিনায়কের সমাধি, এখন ইংরাজদিগের "ডাকবাঙ্গলাতে" পরিণত হইয়াছে! তাহার কবরের প্রস্তরখানি বারাণ্ডায় পড়িয়া রহিয়াছে। হরি! হরি! মানুষ কেমন করিয়া এমন হৃদয়হীনতার কার্য্য করিতে পারে?

'টোগলক' সম্রাটেরা, ইহার কিঞ্চিৎ দূরে, যমুনাতীরে, নূতন দুর্গ ও নগর নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। "পিথোরা"-গড়ে, একদিকে এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর অর্থ উপার্জ্জনের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, "যোগমায়া" নাম দিয়া, এক যোগী পূজা করিতেছেন; পূজার মন্ত্রটিও জানেন না। অন্য দিকে দুটি পুরাতন গোলাকার কক্ষে, ডাকবাঙ্গলা স্থাপিত হইয়াছে। কালের বিচিত্র গতিতে এই মহা বীরভূমির কি পরিবর্ত্তনই ঘটাইয়াছে! ডাকবাঙ্গলাতে বিশ্রাম করিয়া, বর্ত্তমান বা

নূতন দিল্লীতে ফিরিয়া আসি। পথে “সপ্‌দর জঙ্গের” বিরাট সমাধিমন্দির। তাহার চারিদিকে, বিচিত্র-কারুকার্য্যখচিত আরও অনেকগুলি বহু পুরাতন সমাধিমন্দির বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ঐ সকল পার হইয়া আসিয়া নূতন দিল্লী। আফগানি সাম্রাজ্যও, কালে মোগল সাম্রাজ্যের ছায়াতে বিলুপ্ত হইল। তুমি পড়িয়াছ যে, মোগল সম্রাটেরা যদুবংশের সন্তান। প্রথম মোগল সম্রাট বাবর এবং হুমায়ুন, অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন। বীরত্ব এবং বিদ্যা একাধারে সম্মিলিত করিয়াছিলেন। যদুবংশের সন্তান বলিয়া হউক, কিম্বা মহাভারতের পুণ্য ঐতিহাসিক ভূমি বলিয়াই হউক, তাঁহারা বিলুপ্ত ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিলেন। হুমায়ুন, শের আফগান কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া মারবারের মরুভূমিতে পলায়নকালে অমরকোটে সম্রাটচূড়ামণি আকবর জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে, হুমায়ুন যে মসজিদ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, সের সা তাহা শেষ করেন। তাহার নাম “কিল্লা-কোনা” মসজিদ। তাহার পার্শ্বে একটি উচ্চ ত্রিতল ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তাহার নাম “সের মঞ্জিল।” হুমায়ুন সের শাকে পরাভূত করিয়া রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার পর, ইহাতে তাঁহার পুস্তকালয় স্থাপন করেন। একদা তিনি সর্ব্বোচ্চ কক্ষে বসিয়া নিবিষ্টমনে পড়িতেছেন, এমন সময়ে পার্শ্বস্থিত মসজিদ-শীর্ষ হইতে, ‘মোয়াজিন’ নমাজের সময় বিজ্ঞাপন করিল। হুমায়ুন ব্যস্ত হইয়া যেমন অবতরণ করিতেছিলেন, অমনই পদস্খলিত হইয়া, তৃতীয় সোপান হইতে গড়াইতে গড়াইতে একেবারে নীচে পড়িয়া যান। তাহাতে তাঁহার অপমৃত্যু ঘটে।

তাঁহার কুলতিলক পুত্র আকবর, আগ্রাতে দুর্গ ও রাজধানী

নির্ম্মাণ করেন, এবং তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীরও তথায় রাজত্ব করেন। সাহাজাহান পুনরায় রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিয়া, নূতন দিল্লীর দুর্গ ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন। ইহাঁর সময়েই আগ্রা এবং দিল্লীর দুর্গের বিখ্যাত অট্টালিকা সকল ও "তাজমহল" নির্ম্মিত হয়। স্থাপত্যকার্য্য, ইহাঁর সময়ে যেন ভারতবর্ষে চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখন দিল্লীর দুর্গের মধ্যে চল। প্রথমে "দেওয়ান আম্" বা সাধারণ দর্শনগৃহ। রক্ত প্রস্তর স্তম্ভ সারির উপর একটি সুন্দর গৃহ। তিন দিক খোলা, এক দিকে প্রাচীর, তাহার পশ্চাতে কয়েকটি কক্ষ। মধ্য কক্ষটির দ্বিতলে, সম্রাটের সিংহাসন থাকিত। এই কক্ষটি শ্বেত মর্ম্মর-প্রস্তরের কারুকার্য্যে খচিত। এখানেই ময়ূরসিংহাসন থাকিত। তাহার নিম্নে একটি শ্বেত মর্ম্মরবেদী আছে। তাহার উপর উজির বসিতেন। আবেদনপত্রাদি তিনি পাঠ করিয়া এক স্বর্ণ-পাত্রে রাখিতেন। এবং তাহা রজতশৃঙ্খলে উত্থিত হইয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইত। তাহার পশ্চাতে, যমুনাতীরে, শ্বেত-প্রস্তরের শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। কেন্দ্রস্থলে বিখ্যাত "দেওয়ান খাস।" ইহারও তিন দিক খোলা। যমুনার দিকে প্রস্তরের ছিদ্রবিশিষ্ট গবাক্ষ। ইহার স্তম্ভ সকল এবং উপরের ছাদ, সুবর্ণে এবং নানাবিধ বর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। চারি কোণের স্তম্ভের উপর, প্রাচীরে লেখা আছে,—

"যদ্যপি স্বরগ থাকে এই ধরাতলে,
এখানে—এখানে—তাহা এখানে কেবল।"

তাহার বামপার্শ্বে সেইরূপ কক্ষ সারি, সম্রাটের অন্তঃপুর। কক্ষগুলি অতিক্ষুদ্র, কিন্তু অতি মনোহর। যমুনার দিকে একটি

গোল প্রাচীরহীন কক্ষ, গৃহের বহির্ভাগে শোভা পাইতেছে। স্তম্ভের বিরামস্থানে আয়না বসান রহিয়াছে। কিন্তু এই অন্তঃপুরের কক্ষে, কি অন্য কোথাও কপাট নাই। বহুমূল্য পুরু পর্দ্দা, প্রত্যেক দ্বারে ঝুলান থাকিত। দেওয়ানখাসের অন্য পার্শ্বে স্নানের গৃহ। ইহার কক্ষগুলি অতি মনোহর। প্রাচীর এবং ছাদ কাচে সুসজ্জিত। যে দিকে চাহিবে, তোমার শত শত প্রতিবিম্ব দেখিবে। জানি না, নুরজাহান প্রভৃতি কত সুন্দরীর প্রতিবিম্বই এ সকল কাচকক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে। একদিকে একটি কক্ষে জল গরম হইয়া প্রণালীপথে মর্ম্মরনির্ম্মিত ক্ষুদ্র কুণ্ডে আসিত। ইহাতে সুন্দরীরা অবগাহন করিতেন। চারিদিকে তাহাদের তৈলমর্দ্দনের এবং আরামের কক্ষ রহিয়াছে। যখন শত শত সুন্দরীরা সম্রাটকে বেষ্টন করিয়া স্নান করিতেন, কেহ জলে অর্দ্ধ বা পূর্ণ নিমজ্জিতা, কেহ কক্ষে মদালসে উপবিষ্টা বা অর্দ্ধশায়িতা, কেহ জলক্রীড়া করিতেছেন, কেহ বেড়াইতেছেন, কেহ হাসিতেছেন, কেহ গাহিতেছেন, কেহ রসালাপ করিতেছেন, মরি! মরি! কি রূপের ফোয়ারাই চারিদিকে খেলিতে থাকিত। সম্মুখে আর একটি কক্ষ। তাহার মধ্যস্থলে পদ্মের মত একটি কুণ্ড। তাহাতে গোলাপজল রক্ষিত হইয়া, গৃহ সুবাসিত করিয়া রাখিত! এরূপ আরও ৩।৪টি কক্ষ আছে। কে বলিবে, তাহা কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। স্নানকক্ষের সম্মুখেই "মতি-মসজিদ"। শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহাতে রঙ্গের কার্য্য নাই, কেবল শ্বেত মর্ম্মরের উপর কারুকার্য্য। প্রকৃতই ইহা মসজিদের মধ্যে একটি মতি। গৃহটি কি সুন্দর! এখানে সম্রাটকে বেষ্টন করিয়া, অন্তঃপুরবাসিনীরা নমাজ পড়িতেন।

পুরাতন দিল্লী হইতে নূতন দিল্লীতে আসিতে, পথে একটি প্রকাণ্ড সমাধিস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে নিজামদ্দিন নামক জনৈক বিখ্যাত ফকিরের একটি শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত সমাধি আছে। গৃহটি অতি সুন্দর। তাহার কিঞ্চিৎদূরে, একই প্রাঙ্গণে, কবি খসরুর সমাধি। ইহাতে তুমি বুঝিবে, মুসলমান সম্রাটেরা কবিদিগের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তাহারই পার্শ্বে মরি! মরি! কি হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য! যখন মোগলকুলের কংস আরঙ্গজিব, আপন পিতা সাহাজানকে বন্দী করিলেন, তাঁহার কন্যা জেহানারা চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া, পিতার সেবার জন্য, তাঁহার সঙ্গে কারাবাসিনী হন। তাঁহার একটি ক্ষুদ্র মর্ম্মর কবর, মধ্যস্থান শ্যামল দূর্ব্বাদলে শোভিত। কবরের শীর্ষদেশে, একটি শ্বেত মর্ম্মরফলকে, তাঁহার নিজের রচিত একটি কবিতা লিখিত রহিয়াছে;—

"বহুমূল্য আবরণে করিও না সুসজ্জিত
কবর আমার।
তৃণ শ্রেষ্ঠ আবরণ দীন-আত্মা জেহানারা
সম্রাট-কন্যার।"

পিতৃপরায়ণা জেহানারা, রমণীদিগের জন্য, পিতৃভক্তির এবং পবিত্রতার কি আদর্শই রাখিয়া গিয়াছেন! আমি আকবরের সমাধিকে ভিন্ন, আর কোনও সমাধিকে প্রণাম করি নাই। জাহানারার সমাধিকে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম। স্থানটি দেখিয়া আমার কলুষিত হৃদয়ও যেন পবিত্র হইল। স্থানটি একটি মহাতীর্থ।

সমদর্শিনী নীতিতে মহামতি আকবর যে সাম্রাজ্য স্থাপন

করিয়াছিলেন, নরাধম আরঙ্গজিবের দুর্নীতিতে এবং ধর্ম্মোৎপীড়নে, শিবজীর অসিঘাতে, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুর্গের বাহিরে প্রকাণ্ড "জুমা মসজিদের" গগণস্পর্শী স্তম্ভ-শিরে দাঁড়াইয়া দিল্লী দর্শন করিলে বোধ হয়, যেন মুসলমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস, চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। হৃদয় কি ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তেই আন্দোলিত হইতে থাকে! মানবের সম্পদ ও গৌরব কি জলবিম্ব বলিয়াই ধারণা হয়! ইচ্ছা করে না যে, সেই স্তম্ভশিরে অধিরোহণ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করি। পাপমতি আরঙ্গজিবের সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্য ডুবিল। শিবজী তাহার ভিত্তি পর্য্যন্ত চঞ্চল করিয়া গিয়াছিলেন। ভারতের অদৃষ্ট-ক্ষেত্র পাণিপথ যুদ্ধক্ষেত্রে, তাহা নাদের সাহার অসিপ্রহারে টলিয়া পড়িল। নৃসংশ 'নাদের' দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া, নগরকেন্দ্রস্থলস্থিত এক মসজিদের উপর হইতে, দিল্লীবাসীদের বধাজ্ঞা প্রচার করিল। নরশোণিতে দিল্লী ভাসাইয়া, যমুনাকে রক্তবর্ণা করিল। দিল্লী বিলুপ্তপ্রায় হইল। মোগল সাম্রাজ্য শোণিতস্রোতে ভাসিয়া কালসাগরে চিরদিনের জন্য বিলীন হইল।

"আহা! কি কুদিবসে গ্রাসিল রাহু, মোচন হইল না আরও।
"ভাঙ্গিল চুর্ণিল, উলটি পালটি, লুটি নিল যাহা ছিল সারও।"

সেই বধভূমি এখন একটি ফোয়ারার দ্বারা চিহ্নিত আছে। আজ আর না। আজ দিল্লী-দর্শন-কাহিনী শেষ করিব। নরপশু নাদের সাহা দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া এবং নরহত্যা-স্রোতে দিল্লী ভাসাইয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মোগলরাজলক্ষ্মী আর মাথা তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার ছায়া ক্রমে বৃটিশ-বৈজয়ন্তী-ছায়াতলে বিলীন হইল। যে ইংরাজ মোগলের ছায়াতে ভারতে

বাণিজ্য করিতে আইসে, সে মোগলের সিংহাসনে বসিল। আকবরের উত্তরাধিকারীকে তাহার বৃত্তিভোগী হইয়া, সামান্য ব্যক্তির মত দিল্লী নগরে বসতি করিতে হইল। ময়ূরসিংহাসন নাদের স্বাহা লইয়া গিয়াছিল, দেওয়ান-আম, দেওয়ান-খাস, বৃটিশ সৈন্য-নিবাস হইল। ভারত বীরশূন্য, পদতলে দলিত, দেখিয়া বৃটিশ সিংহের রাজ্যলিপ্সা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ঘোরতর অধর্ম্ম ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, তাহারা ক্রমে ক্রমে উত্তর ভারতের পঞ্জাব পর্য্যন্ত উদরসাৎ করিল। রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইল। ভারতের মানচিত্র লাল হইয়া গেল। কিন্তু রাজার উপর একজন মহারাজা, শক্তিমানের উপর একজন মহাশক্তিমান আছেন। তাঁহার রাজনীতি, তাঁহার শক্তি অলঙ্ঘ্য। ঝান্‌সির বীর-রাণী লক্ষ্মী বাই, সিংহিনীর মত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"মেরা ঝান্সী নেহি দেঙ্গে?" সিপাহি-বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল, ইংরাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল, বৃটিশ সিংহাসন টল টল করিতে লাগিল। দিল্লী ভারতের যুগযুগান্তরীন রাজধানী। বিদ্রোহীগণ চারিদিক হইতে দিল্লীতে সমবেত হইল। বৃত্তিভোগী বৃদ্ধ মোগল সম্রাটের উত্তরাধি-কারীকে, বলে যষ্টির মত দাঁড় করাইয়া, মোগল সাম্রাজ্য বিঘোষিত করিল। শিখ সৈন্য সহায় করিয়া, ইংরাজ দিল্লী আক্রমণ করিলেন। দিল্লীর চারিদিকে দৃঢ় উচ্চ প্রাচীর। তাহার বিশাল নগর-দ্বার সকল রুদ্ধ। পার্শ্বস্থিত অনুচ্চ শৈল-শেখর হইতে ইংরাজ "কাশ্মীর-দ্বারের" উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দ্বার এত দৃঢ় যে, প্রায় চারি মাস কাল গোলা বর্ষণ করিয়াও তাহা বিনষ্ট করিতে পারিলেন না। অবশেষে মৃত্যু সংকল্প

করিয়া, কতক সৈন্য বিদ্রোহীদিগের অগ্নিবৃষ্টি পার হইয়া আসিয়া, প্রাচীরের তলে স্তূপকার বারুদ রাখিয়া, অগ্নিসংযোগ দ্বারা প্রাচীরের এক স্থলে সুরঙ্গ করিয়া, অমিতপ্রতাপে সেই সুরঙ্গ দিয়া দিল্লী প্রবেশ করিল। বারুদের নির্ঘাতে এবং নির্ঘোষে ভূমিকম্প হইল, দিল্লী কাঁপিল, বিদ্রোহীরা টলিল, পলায়ন করিতে লাগিল। দিল্লী আবার নরশোণিতে প্লাবিত হইতে লাগিল। বিদ্রোহীদিগের নায়ক কেহই ছিল না, প্রকৃত যুদ্ধবিদ্যা কেহই জানিত না। যদি নগরে অবরুদ্ধ হইয়া না থাকিয়া, তাহারা বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করিত, ৪০,০০০ বিদ্রোহী এক ফুৎকারে ক্ষুদ্র ইংরাজ সৈন্য উড়াইয়া দিতে পারিত। সেনাপতি এবং নীতিশূন্য বিদ্রোহীগণ, কর্ণধারশূন্য অর্ণবযানের ন্যায়, এই ঝটিকায় উড়িয়া গেল। বিজয়ী নিকলসন্, নগর প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া, পলায়নপর বিদ্রোহীদিগের ধ্বংসসাধন করিতেছিলেন, পার্শ্বস্থিত একটি কক্ষে লুক্কায়িত জনৈক বিদ্রোহীর গুলিতে তিনি পতিত হইলেন। কাশ্মীরদ্বারের অবস্থা ঠিক সেইরূপ ভাবেই রক্ষিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক তোপের গোলার দাগে, প্রত্যেক ভগ্নাংশে, সিপাহিবিদ্রোহের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। নিকলসন্ বিজয়ের সময়ে যেখানে পড়িয়াছিলেন, সেই স্থানটিতে একটি স্মৃতিলিপি আছে। শৈলমালার যে শৃঙ্গ হইতে দিল্লীতে গোলা বর্ষণ করা হয়, তথায় এখন মনোহর "বিজয়স্তম্ভ" বিরাজ করিতেছে। যুদ্ধে যাঁহারা পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম তাহার চারি পার্শ্বে মুদ্রিত রহিয়াছে। অনতিদূরে, যে "হিন্দু রাওর" অট্টালিকাতে ইংরাজগণ সমবেত হইয়াছিলেন, এবং যে গৃহে মহিলাগণ রক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা

এখনও বিদ্যমান আছে। তাহাদের মধ্যস্থলে ধর্ম্মাশোকের ২,০০০ বৎসর পূর্ব্বের নির্ম্মিত, একটি নীতিস্তম্ভ, উপরি-উক্ত বীরত্বের নিদর্শনের সঙ্গে ধর্ম্মের প্রতিযোগিতা করিতেছে, এবং নীরবে পার্থিব গৌরব ও সাম্রাজ্যের নশ্বরতা বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

দিল্লীবিজয়ের পর, বৃত্তিভোগী সম্রাটের পুত্রগণ প্রাণভয়ে হুমায়ুনের সমাধিতে পলায়ন করিয়াছিলেন। এই বৃহৎ ও শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ সমাধি, ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে অবস্থিত। হুমায়ুনের পত্নী হাজি বেগম ইহা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার পুত্র সম্রাট আকবর শেষ করেন। সমাধিটি একটি ক্ষুদ্র দুর্গ বলিলেও হয়। ইংরাজ সেনাপতি হড্‌সন্ ইহা আক্রমণ করেন, এবং আত্মসমর্পণ করিবার জন্য, সম্রাটকুমারদিগের কাছে সংবাদ প্রেরণ করেন। তাঁহাদের প্রাণের কোনও বিঘ্ন হইবে না বলিয়া আশ্বস্ত করা হইলে, তাঁহারা আত্মসমর্পণ করেন। তখন, নৃশংস হড্‌সন্, এই শিশুদিগকে দিল্লীদ্বারের কাছে, বন্দীভাবে লইয়া গিয়া, স্বহস্তে তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করেন। কেবল তাহাই নহে, মৃত কুকুরের ন্যায়, তাঁহাদের দেহ দিল্লীর প্রকাশ্য স্থানে ফেলিয়া রাখেন। নীচ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে, মানুষ হিংস্র পশু হইতেও অধম হইয়া পড়ে। অবশ্য, হড্‌সনের এই কসাই-কার্য্যের স্থানদ্বয়ে কোনও স্মৃতিলিপি নাই। কিন্তু যত কাল অতীত হইয়া যাইতেছে, যত লোকের মস্তিষ্ক সিপাহি-বিদ্রোহ-সম্বন্ধে নৃশংসতাশূন্য হইতেছে, ততই হড্‌সনের নরপশুতা এরূপ জলন্ত অক্ষরে ইতিহাসের অঙ্গে ভাসিয়া উঠিতেছে যে, তাহার উত্তরাধিকারী ও বন্ধুগণ, এ কলঙ্ক অপনয়ন করিবার

জন্য এখন যত চেষ্টাই করুন না কেন, হতভাগ্য সম্রাটকুমার-দিগের রক্ত তাহার হস্ত হইতে স্বয়ং সর্ব্বপাপহারী অগ্নি কি পারাবারও অপনয়ন করিতে পারিবেন না। এইরূপে হড্‌সন্ আততায়ীর হস্তে, জগদ্বিখ্যাত মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ ছায়াটি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। সুকুমার শিশুর রক্তে, ইংরাজ-রাজ্য দিল্লীতে পুনরভিষিক্ত হইল। মানবের ইতিহাস কি শিক্ষার স্থল! বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যের নীতিসমূহ কি দূরদর্শী, কি দুর্লঙ্ঘ্য! তাই বলিয়াছি, দিল্লী হিন্দুদিগের মহাশ্মশান; মুসলমানদিগের পাঁচটি সাম্রাজ্য দিল্লীর ধূলাতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। একে একে পাঁচটি সাম্রাজ্যের ইতিহাস, পাপের পতন, দুর্ব্বলের ধ্বংস, সবলের উত্থান, কর্ম্মহীনের লয়, কর্ম্মীর বিজয়, নর-রাজ্যের নশ্বরতা, সৃষ্টিরাজ্যের অবিনশ্বরতা, অধর্ম্মের ক্ষয়, ধর্ম্মের জয়, দিল্লীর অঙ্গে অঙ্গে অঙ্কিত রহিয়াছে। পাঁচটি সাম্রাজ্যের ভস্ম অঙ্গে মাখিয়া, দিল্লী আজি কি উদাসীন মূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছে। এত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, এত বিপ্লব, পৃথিবীর আর কোনও নগর দর্শন করে নাই, ভারত ভিন্ন পৃথিবীর আর কোনও দেশ দর্শন করে নাই, হিন্দুজাতি ভিন্ন অন্য কোনও জাতি এত বিপ্লবতরঙ্গাভিঘাতে জীবিত থাকিতে পারে নাই। রোম নাই, গ্রীস নাই, তাহাদের অপেক্ষা প্রাচীন ভারত আছে। সেই রোমজাতি, সেই গ্রীকজাতি নাই, কিন্তু তদপেক্ষা পুরাতন হিন্দুজাতি কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াও এখন আছে। ভারত পড়ে, মরে না। হিন্দুজাতি বলহীন হয়, জীবহীন হয় না। কর্ম্মহীন হয়, ধর্ম্মহীন হয় না। ধর্ম্মের সঙ্গে, কর্ম্মের যোগ হইলে, আবার মাথা তুলিয়া উঠিবে। বাহুবল নশ্বর, ধর্ম্মবল অমর।

আগ্রা।

পূর্ব্ব-পত্রে দিল্লীর কথা শেষ করিয়াছি। দিল্লীতে এক দিন হোটেলে, এবং দুই দিন বন্ধু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কালেজের প্রফেসরের বাসায় ছিলাম ; আহার যোগাইতেন, দিল্লীর স্বনাম-খ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র সেন। ইহারা ছুটি দিন কি যত্নই করেন! দার্জিলিঙ্গে যে সর্দ্দি হইয়াছিল, তাহা দিল্লী পর্য্যন্ত ভুগিতেছিলাম। হেম বাবু খাওয়াইলেন, চিকিৎসা করিলেন, আসিবার সময়ে ঔষধ সঙ্গে দিলেন। আমি বলিলাম, আমি ঠিক যেন কবি হেম বাবুর 'বাঙ্গালীর মেয়ের' অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম,—

"খেয়ে যায়, নিয়ে যায়, আর যায় চেয়ে,
"হায়! হায়! ওই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।"

দিল্লী হইতে আগ্রায় আসি। আগ্রায় প্রথম সেকেন্দরা দেখিতে যাই। সেকেন্দরা সম্রাট আকবরের সমাধি, আগ্রা হইতে পাঁচ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। বাবর ও আকবরের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যে প্রবণতা ছিল, তজ্জন্য গোঁড়া মুসলমানেরা যে তাঁহাদিগকে কাফের বলিত,—সেকেন্দরা দেখিলে তাহা বিলক্ষণ বলিতে পারা যায়। সেকেন্দরাটি ঠিক যেন একটি হিন্দুর দেবালয়। মুসলমান সমাধির সেই গোলাকার গুম্বেজের চিহ্ন-মাত্র নাই। হিন্দু-দেবালয়ের চূড়া স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। সকল সমাধিতেই মূল কবর মাটিতে ; তাহা মাটির স্তূপমাত্র। এই স্তূপের উপরের গৃহে, ঠিক একটি কবরাকৃতি, প্রস্তর কিম্বা ইষ্টকের

দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এই কবরকক্ষটি সেকেন্দরাতে বড় অন্ধকার। সম্রাট আকবরের পোষাক যেমন আড়ম্বরশূন্য ছিল, তাঁহার কবরও সেইরূপ। তাহা কেবল একটি নির্ম্মল শ্বেতপ্রস্তরের বেদীমাত্র। গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক, এক সহস্র টাকা মূল্যের একখানি ছাদ না কি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাও শুনিলাম, মোল্লাগণ চুরী করিয়াছেন। অট্টালিকার ত্রিতলে একটি শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত অতি সুন্দর কক্ষ আছে। ইহাতেও শ্বেতমর্ম্মরের একটি কবরাকৃতি আছে। পূর্ব্বে দ্বিতল সুবর্ণে ও অন্য বর্ণে, রঞ্জিত ও চিত্রিত ছিল। তাহা কালে মলিন হইয়া গেলে, পুনঃসংস্কার করা বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া, ইংরাজরাজ তাহার উপর চুন-কাম করিয়া দিয়াছেন। সমাধিটি এখন দেখিতে ঠিক যেন শ্বেতবসনাবৃতা শোকাতুরা হিন্দুবিধবা। চারি দিকে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ উদ্যানে সজ্জিত ছিল। এখনও দুই চারিটি গাছ ও ফুল আছে। একটি সুন্দর গোলগৃহ সেই প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে এখন ইংরাজদিগের আরামগৃহের কার্য্য করিতেছে। আমি যে দিন দেখিতে যাই, সে দিন বহুতর সৈন্য ও তাহাদের কর্ম্মচারীরা বিহার করিতে আসিয়াছিলেন। সেকেন্দরা বহুকক্ষবিশিষ্ট। দুই একটি কক্ষে আরও দুই একটি কবর আছে। আকবর মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার উদার রাজনীতিবলে হিন্দুমুসলমানকে মিলিত করিয়া যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, তাহা অক্ষয় হইবে। কক্ষে কক্ষে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের কবর হইবে। তিনি জানিতেন না যে, তিন পুরুষ না যাইতে, আরঙ্গজিব সেই নীতির বিপর্য্যয় ঘটাইয়া, সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিয়া যাইবেন। আজ সেকেন্দরার সমুদয় কক্ষ

শূন্য পড়িয়া আছে। প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে আর একটি প্রাঙ্গণ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকা আছে। শুনিলাম, আকবরের মৃত্যুর পর, তাঁহার পত্নী, যোধপুররাজকন্যা, যোধা বাই ইহাতে বাস করিতেন। মুসলমানী হইবার পরও, রাজপুত মহিষীগণ হিন্দুরমণীর পাতিব্রত্য রক্ষা করিতেন।

অপরাহ্নে প্রথমতঃ যমুনা পার হইয়া "রাম বাগ" বা "আরাম বাগ" দেখিতে যাই। এটি যমুনার উপর একটি বৃহৎ উদ্যান। যমুনার গর্ভ হইতে ইহার প্রাচীর সরলভাবে উঠিয়াছে।

তাহার পর এতমাদদ্দৌলা দেখিতে যাই। এটি নুরজাহানের মাতার এবং পিতার সমাধিগৃহ। সেই ভুবনমোহিনীর জনক-জননী পাশাপাশি নিদ্রা যাইতেছেন। সমাধিটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও, শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের এরূপ সুচারু অট্টালিকা, যেন আর দেখি নাই। ঠিক যেন একটি ছবি। চারিদিকে সুন্দর ফলপুষ্পের উদ্যান এখনও রক্ষিত হইয়াছে।

তাহার পর যমুনা পার হইয়া আসিয়া, জগদ্বিখ্যাত তাজ-মহল এ জীবনে দ্বিতীয় বার দেখিতে যাই। তাজ তুমি দেখি-য়াছ, অতএব তাহার কথা আর কি লিখিব? যিনি তাজ দেখি-য়াছেন, তিনি যিনিই হউন, মোহিত হইয়াছেন। এক জন লিখিয়াছেন,—

"তাজ প্রকৃতই একটি কবিতা। উহা কেবল স্থাপত্যের একটি বিশুদ্ধ আদর্শ নহে; উহা এরূপ সৃষ্টি যে, তাহাতে কল্প-নার পরিতৃপ্তি হয়, কারণ সৌন্দর্য্যই উহার বিশেষ লক্ষণ। তুমি কি কখনও আকাশে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছ? এই দেখ, একটি আকাশ হইতে মর্ত্তে আনীত হইয়াছে, এবং অনন্তকালের

বিস্ময়ের জন্ত এখানে স্থাপিত হইয়াছে। তথাপি উহা এমনই লঘুভার, এমনই বায়ুবৎ বোধ হয়, দূর হইতে দেখিলে, উহার গগণস্পর্শী চূড়াবলীসহ এমনই শিশির এবং সূর্য্যালোকে নির্ম্মিত অট্টালিকা, সূর্য্যকিরণে ফুটনোন্মুখ একটি রজতবিম্ব বলিয়া বোধ হয় যে, উহাকে স্পর্শ করিবার এবং উহার চূড়াতে চড়িবার পরও, উহা প্রকৃত কি না তোমার সন্দেহ হয়।” শ্লীমেন বলেন ;—“তাজদর্শনের পর, আমি আমার স্ত্রীকে অট্টালিকা-সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করি। তিনি উত্তর করিলেন, আমি কি মনে করি, তাহা তোমাকে বলিতে পারি না, কারণ এরূপ একটি অট্টালিকা সমালোচনা করিবার শক্তি আমার নাই। তবে আমার হৃদয়ের ভাব তোমাকে বলিতে পারি। এরূপ একটি সমাধি পাইবার জন্যে আমি কাল মরিতে পারি।” তাজ দর্শন করিয়া যে পথে তোমাকে লইয়া বেড়াইয়াছিলাম, কেবল সেই পথেই বেড়াইলাম। যে স্থানে তোমাকে লইয়া বসিয়াছিলাম, কেবল সেই স্থানেই বসিলাম। উদ্যানের অন্য পথে যাইতে কি অন্য অংশ দেখিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। সেই পূর্ব্ব-দর্শন-স্মৃতিতে এবং আর একখানি মুখের স্মৃতিতে আমি বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিলাম।

তাহার পর আগ্রার দুর্গ দেখিতে গেলাম। এই দুর্গ আকবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা বলেন, তিনি এই নগরের নাম এ জন্যে আকব্বরাবাদ রাখিয়াছিলেন। তাহা হইতে আগ্রা। হিন্দুরা বলেন, ‘অগ্রবণ’ ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল, তাহা হইতেই আগ্রা। দিল্লীর মত আগ্রাতে ঠিক সেইরূপ দেওয়ান-আম, দেওয়ানখাস, শিশমহল, মতিমসজিদ, দুর্গের বাহিরে জুম্মা

মসজিদ পর্য্যন্ত আছে। তবে আগ্রার অট্টালিকাগুলি অপেক্ষাকৃত বড়। কিন্তু দিল্লীর অট্টালিকা আমার চক্ষে অপেক্ষাকৃত সুন্দর বোধ হইয়াছিল। গৃহ সকল ঠিক দিল্লীর মত যমুনার তীরে অবস্থিত, ঠিক সেইরূপ—

"পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি
"অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও।"

দেওয়ান-খাসের ও স্নানাগারের মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণে এক পার্শ্বে একটি কৃষ্ণ এবং অন্য পার্শ্বে আর একটি শ্বেতমর্ম্মর আসন রক্ষিত হইয়াছে। আমাদের পাণ্ডা বলিলেন, প্রথমটিতে স্বয়ং আকবর এবং দ্বিতীয়টিতে তাঁহার হিন্দুমন্ত্রী খ্যাতনামা বীরবল বসিয়া সান্ধ্য গগণতলে যমুনার লহরী দেখিতে দেখিতে মন্ত্রণা ও গল্প করিতেন। যাট সূর্য্যমল দিল্লী জয় করিয়া প্রথম আসনে বসিলে, আসন মনোদুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং রক্ত উদ্গীরণ করে। পাণ্ডা সেই বিদীর্ণ রেখা ও একটি লাল দাগ রক্ত বলিয়া দেখাইলেন। অন্যদিকে অন্তঃপুরকক্ষের সংলগ্ন, রক্তপ্রস্তরে নির্ম্মিত, আর একটি প্রকাণ্ড অন্তঃপুর-মহল আছে। এটি রাজপুতকন্যা যোধা বাইয়ের মহল বলিয়া খ্যাত। তিনি মুসলমান মহিষীগণ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতেন এবং এই মুসলমান অন্তঃপুরেও হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করিতেন।

দেওয়ান-খাসে দাঁড়াইয়া যমুনার দিকে চাহিয়া মনে হইল,—

"তব জল কল্লোল সহ কত সেনা
"নাদিল কোনও দিন সমরে ও।
"তব জল বুদ্‌বুদ সহ কত রাজা
"পরকাশিল, লয় পাইল ও।

"আজি সব নীরব রে যমুনে! সব
"গত তব বিভব কালে ও।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, সুললিত 'যমুনা-লহরী' বিষাদমগ্ন-হৃদয়ে গাহিতে গাহিতে আগ্রা-দর্শন শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

জয়পুর।

আগ্রা হইতে আমরা জয়পুর যাই। দিল্লীর ডাক্তার হেম বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর সংসারচন্দ্র সেন জয়পুরের মহারাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী। তাঁহার মন্ত্রীও এক জন বাঙ্গালী—কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইহাঁরা উভয়ে জয়পুর স্কুলের শিক্ষক হইতে এরূপ উচ্চ পদ অধিকার করিয়াছেন। আমরা সংসার বাবুর অতিথি হই। যেখানে বাঙ্গালী, সেখানে দুর্গাকালী, সেখানে পাঁঠাবলি, আর সেখানেই দলাদলি।

জয়পুরে পঁহুছিয়াই আমরা প্রথমতঃ রাজবাটী দর্শন করিতে যাই। একটি প্রকাণ্ড নগরের অষ্টম ভাগ ব্যাপিয়া এই রাজবাটী। অতএব ইহার বর্ণনা কি করিব? ইহা একটি মনোহর হর্ম্ম্যাবলীর উদ্যান বলিলেও হয়। এক পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের চারিদিকে সমুদয় বিচারালয় ও কার্য্যগৃহ সজ্জিত রহিয়াছে। রাজাদিগের রাজ্যে উচ্চতম কর্ম্মচারীরাও ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া, যাবতীয় রাজকার্য্য ও বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ

করেন। এখানে আইনকানুনের তত ঘটা নাই, নর-রক্ত-শোষক জলৌকা উকিল মোক্তারের হট্টগোল নাই। বিচারকার্য্য এক-রূপ মোটামুটি সরল ও সহজভাবে নিষ্পন্ন করা হয়। বৃটিশ রাজ্যের ন্যায়, ধর্ম্মাবতারদের সুবিচার ও সূক্ষ্ম বিচারের জালে পড়িয়া, প্রজাদের প্রাণান্ত হয় না। প্রেমিক বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন,—

"পরাণ ছাড়িলে পিরীত না ছাড়ে।"

বৃটিশরাজ্যেও তাই,—

"পরাণ ছাড়িলে উকিলে না ছাড়ে।"

হিন্দুরাজ্যে বিচারকার্য্য কিরূপ সহজে নিষ্পন্ন হইত, এ সকল স্থান দেখিলে কতক বুঝিতে পারা যায়। তবে ক্রমে ক্রমে সকলই "লাল" হইয়া যাইতেছে।

অন্য প্রাঙ্গণে "দেওয়ান-আম," তৃতীয় প্রাঙ্গণে "দেওয়ান-খাস," শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের দুগ্ধ ফেণ-নিভ অমল ধবল শোভায় শোভা পাইতেছে। ইহাদের স্তম্ভের অবসরে, নানা বর্ণের পুরু পর্দ্দা ঝুলান রহিয়াছে এবং গৃহ বহুমূল্য উপকরণে ও স্ফটিক ঝাড়ে সজ্জিত রহিয়াছে। এই দুই গৃহ দেখিলে, দিল্লীর ও আগ্রার দেওয়ান-গৃহ সকল কিরূপ সজ্জিত থাকিত, বুঝিতে পারা যায়। রাজবাটীর কেন্দ্রস্থলে মহারাজার আবাস-ভবন 'চন্দ্রমহল।' একটি প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা, বহুমূল্য ইংরাজী উপকরণে সজ্জিত। তাহার পশ্চাতে প্রশস্ত পুষ্পোদ্যান, জল-প্রণালীতে বিভক্ত এবং ফোয়ারাতে শোভিত। উদ্যানের অপর প্রান্তে 'গোবিন্দজীর' মন্দির। বৃন্দাবন হইতে আনীত হইয়া গোবিন্দজী এই রাজপুরী মধ্যে স্থাপিত হন। মূর্ত্তিটি কৃষ্ণপ্রস্তর-

নির্ম্মিত, বড় সুন্দর বলিয়া শুনিলাম। কিন্তু আমি তেমন অসা-মান্য সৌন্দর্য্য কিছু দেখিলাম না। পূজক ব্রাহ্মণ বাঙ্গালী। এক দল রাজপুতনী বসিয়া কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিতেছে, মধ্যস্থলে একজন অর্দ্ধনগ্ন পুরুষ দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে নৃত্য করিতেছে। দৃশ্যটি হৃদয়স্পর্শী, অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম ও শুনিলাম। তাহার পর, মৃত মহারাজা রাম সিংহের বৈঠকখানা দেখিলাম। উহা এখন বিলিয়ার্ড খেলার গৃহ হইয়াছে। উহার উপকরণে এখন 'চন্দ্রমহল' সজ্জিত হইয়াছে। তাহার পর 'বাদলমহল।' ইহা একটি বৃহৎ নীল সলিলপূর্ণ সরসীতীরে শোভিত। সম্মুখে উদ্যান, পশ্চাতে সরোবর। অট্টালিকা সুন্দর, সুশীতল। বর্ষাকালে মহা-রাজ এখানে একদিন দরবার করেন। রাজবাটীর আর এক প্রান্তে 'হাওয়াই মহল' বহু তলায় একটি অতি উচ্চ রথের মত শোভা পাইতেছে। বোধ হয়, এই অট্টালিকাতে গ্রীষ্মকালে বেশ বাতাস খেলে বলিয়া, ইহার নাম 'হাওয়াই মহল।' মহল হইতে মহলান্তরে এবং রাজবাটীর সর্ব্বত্রে বিচরণ করিবার জন্যে, আবৃত ইষ্টকনির্ম্মিত পথ সকল শ্বেত লতার মত চারিদিকে নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরবাসী অসূর্য্যম্পশ্যা রূপসীরা এই সকল পথে সর্ব্বত্রে যাতায়াত করেন। মহারাজা যে রাত্রি যে মহিষীর সঙ্গে অতিবাহিত করিবেন, আদেশ করিলে, তিনি সজ্জিতা হইয়া, এই সকল পথে, 'চন্দ্রমহলের' অপর পার্শ্বস্থিত অন্তঃপুর মহল হইতে প্রোষিতভর্ত্তৃকা হইয়া অভিসারে উপস্থিতা হন। তুমি যদি একজন রাজমহিষী হইতে, তবে কি করিতে বল দেখি? অথচ ইহাঁরাই অম্লানবদনে স্বামীর চিতারোহণ করি-তেছেন। শুধু তাহা নহে। বর্ত্তমান মহারাজা এক জন বৃন্দা-

বনের ভিখারীমাত্র ছিলেন। সে কথা পরে বলিব। তিনি জয়-পুরের সিংহাসন পাইবার পর, যোধপুরের রাজকন্যাকে, ইহাঁদের রাজনীতি অনুসারে বিবাহ করেন। কিন্তু, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব স্ত্রীকে, শুনিলাম, সমধিক ভাল বাসেন। একদা রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু যদি বাঞ্ছনীয় থাকে, আমাকে বল, তুমি আমায় কখনও কিছু চাহ নাই।" পতিব্রতা সতী উত্তর করিলেন ;—"আমার কিছুই বাঞ্ছনীয় নাই। লোকে আশী-র্ব্বাদ করে, 'তোর স্বামী মহারাজা হউক।' বিধাতা আমার স্বামীকে মহারাজা করিয়াছেন, অতএব আমার আর বাঞ্ছনীয় কি হইতে পারে ?" মহারাণী হইয়াও ইহাঁর চরিত্রের কিছুমাত্র রূপান্তর হয় নাই। ইনি রাজার মহিষীভার গ্রহণ না করিয়া, দাসীভাবে পূর্ব্ববৎ তাঁহার সেবা করেন। এক পাত্রে আহার করেন, ছায়ার মত তাঁহার সঙ্গে থাকেন। সতিনী মহাতেজ-স্বিনী রাজপুত-কন্যা। গল্প এরূপ যে, মহারাজ এক দিন তাঁহার কি একটি কথা গ্রাহ্য করেন নাই। বীরবালা লম্ফ দিয়া প্রাচীর হইতে অসি লইয়া নিষ্কাষিত করেন, ভয়ে মহারাজা চণ্ডিকার পদানত হন। এরূপ সপত্নীর ছায়াতে থাকিয়াও, পূর্ব্ব পত্নী যে সতীত্বের ও নারীত্বের আদর্শ দেখাইতেছেন, তাহাতে সমস্ত জয়পুর মোহিত।

অপরাহ্ণে আমরা জয়পুরের শিল্প বিদ্যালয় দেখিতে যাই। মৃত মহারাজা রাম সিংহের এটি একটি মহৎ কীর্ত্তি, তিনিই ইহা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এখানে চিত্রের, কাষ্ঠের, পিত্তল কাঁসা এবং মাটীর পাত্র ও পুতুল ইত্যাদি নির্ম্মাণের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শিল্পবিদ্যার বেশ উৎকর্ষ দেখিলাম। একটি

কমণ্ডলু কিনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল। তাহারা কিনিতে দিল না। বোধ হয়, ভেক লইব বলিয়া ভয় হইয়াছিল!

তাহার পর, মহারাজের 'রামবাগ' দেখিতে যাই। এত বড় এবং মনোহর উদ্যান, বুঝি, আর কোথাও নাই। তাহার এক পার্শ্বে মিউজিয়ম বা 'আজবের ঘর' নির্ম্মিত হইতেছে। এই গৃহটির নির্ম্মাণে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে; ঘর ত নহে, একখানি ছবি। একটি প্রশস্ত দুই তল উচ্চ 'হল,' তাহার তিন পার্শ্বে কক্ষের সারি, তার পার্শ্বে একটি প্রাঙ্গণ এবং চতুঃপার্শ্বে আবার কক্ষের সারি। কক্ষ সকল স্বর্ণমিশ্রিত নানা বর্ণে সুকৌশলে চিত্রিত। হলের উপরিস্থ গবাক্ষে, কাঁচে, নানা বর্ণে কৃষ্ণের ব্রজলীলা চিত্রিত রহিয়াছে। অট্টালিকার প্রাচীরের গায়ে, স্থানে স্থানে মহাভারত ও রামায়ণের নানা দৃশ্য চিত্রিত হইয়াছে। উদ্যানে ফোয়ারা ছুটিতেছে, চক্রাকারে ঘুরিতেছে; ব্যাণ্ড বাজিতেছে; তালে তালে রাজপুত সর্দ্দারগণের অশ্ব ছুটিতেছে। এখনও তাহাদের পার্শ্বে তরবারি ঝুলিতেছে, অস্তমিত বীরত্বের ও রাজপুত ইতিহাসের সাক্ষী দিতেছে। গ্যাসের আলোকে, অট্টালিকা ও উদ্যান অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। মুহূর্ত্ত সেই শোভা নয়ন ভরিয়া দেখিলাম।

পর দিবস প্রাতে, হস্তিপৃষ্ঠে, ঐতিহাসিক 'আম্বের' দেখিতে গেলাম। জয়পুরের নগরতোরণ পার হইয়াই আম্বেরে প্রবেশ করি। প্রবাদ, আম্বেরে মহামারী হওয়াতে, রাজা জয়সিংহ কর্ত্তৃক তাহার পার্শ্বে জয়পুর নগর স্থাপিত হয়। রাস্তার উভয় পার্শ্বে পুরাতন আম্বেরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথম একটি প্রশস্ত ঝিল ও তাহার মধ্যস্থলে একটি সুন্দর অট্টালিকা জীর্ণা-

বস্থায় শোকের মূর্ত্তির মত দণ্ডায়মান দেখিলাম। পশ্চাতে পর্ব্বত-শ্রেণী। তাহার পর, আম্বের-দুর্গের তোরণে প্রবেশ করিয়া, দুর্গে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। আম্বের দুর্গ গিরিশেখরে। তাহার পাদমূলে আর একটি ঝিল, তাহার মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র কলপুষ্পের উদ্যান কি শোভাই বিকাশ করিতেছে! এই ঝিলের পার্শ্ব বাহিয়া, আমরা খ্যাতনামা আম্বের-দুর্গে প্রবেশ করি। প্রথম একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। তাহার চারি পার্শ্বে অশ্বশালা ও সৈনিকনিবাস। এক দিকে, দ্বিতলে একটি সুন্দর মন্দিরে, 'যশোরেশ্বরী কালী' বিরাজ করিতেছেন। প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া আনিবার সময়ে, মানসিংহ, জননীকেও বন্দিনী করিয়া আনিয়া তাঁহার রাজপুরী মধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন। আমরা যখন দর্শন করি, তখন পূজা শেষ হইয়াছে। প্রত্যহ একটি অজ-মুণ্ড মাতাকে বলিদান দেওয়া হয়। মাতার সঙ্গে বঙ্গদেশের এই নৃশংস জীবহিংসাপাপও এখানে প্রবেশ করিয়াছে। তবে ইহারা বীরপুরুষ। ইহাদের বলিদান পদ্ধতি বঙ্গদেশের মত তেমন নিষ্ঠুর ব্যাপার নহে। মানুষ যত কাপুরুষ হয়, ততই নিষ্ঠুর হয়। নিতান্তই বলিদান দিতে হইবে, তাই যেন অনিচ্ছায়, প্রাঙ্গণের এক কোণে এই কার্য্য সমাপন করা হয়। খানিকটা বালির উপর ছাগলটিকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া, অকস্মাৎ খড়্গাঘাতে তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করা হয়। রক্তটা বালির উপর মাত্র পড়ে, এবং প্রাঙ্গণভূমি স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত করা হয়। আমাদের দেশের সেই বাদ্য, সেই নৃত্য, সেই মহিষ পাঁঠার উপর বীরত্ব, সেই ফাঁস, সেই হাঁড়িকাঠ, সেই টানাটানি, সেই পশুত্ব, সেই হৃদয়-বিদারক নিষ্ঠুরতা, এখানে নাই। হরি! হরি! ধর্ম্মের নামে জগতে কত

অধৰ্ম্মই সাধিত হয়। মানুষ যখন অম্লানবদনে নরবলি, এমন কি পুত্র কন্যা বলি পর্য্যন্ত দিতে পারে, তখন এই নির্ব্বাক্ নিরপরাধ পশুহত্যা তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে কেন?

মন্দিরের পর, দেওয়ান-আম, দেওয়ানখাস, অন্তঃপুর-মহল ইত্যাদি ঠিক দিল্লীর অনুকরণেই সজ্জিত রহিয়াছে। সকলই শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত, শিশমহলটি যেন দিল্লী আগ্রা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। একটি কক্ষে কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থস্থানের দৃশ্য প্রাচীরে চিত্রিত রহিয়াছে। চিত্রকর যে বর্ত্তমান শিল্প-বিজ্ঞানে নিতান্ত অপটু ছিল, এমন বোধ হইল না। ইহারই পার্শ্বে আবার প্রকাণ্ড অন্তঃপুর-মহল। তাহাতে যাবতীয় অন্তঃ-পুরবাসিনীগণ বাস করিতেন। আজ তাহা ব্যাঘ্রের বাসস্থান হই-য়াছে। কালের ও মানব-অদৃষ্টের কি বিচিত্র গতি! শুনিলাম, ব্যাঘ্রে সম্প্রতি মানুষ মারিয়াছে। তাই বাঙ্গালী বীরমন্ত্রী, অন্তঃ-পুর-মহলের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া, অন্তঃপুর-মহলে ব্যাঘ্রদিগের নির্ব্বিবাদ অধিকার করিয়া দিয়াছেন। বীরকুলর্ষভ মানসিংহ এই আম্বের-দুর্গ ও নগর নির্ম্মাণ করেন। যে মানসিংহ কাবুল হইতে বঙ্গদেশের যশোর পর্য্যন্ত বিজয় করেন, যাঁহার অসির অগ্র-ভাগে আকবরের মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত ছিল, যে আম্বেরের নামে সমস্ত ভারত আসিন্ধু হিমাচল কম্পিত হইত, এবং যাঁহাকে মোগল সম্রাট আকবর পর্য্যন্ত ঈর্ষ্যা ও রাগরক্ত নয়নে দর্শন করিতেন, আজ সেই আম্বেরের, সেই মানসিংহের আম্বেরের এই অবস্থা! তাঁহার অন্তঃপুর ব্যাঘ্রপুরে পরিণত হইয়াছে। মানসিংহ, তোপের মুখে বীরকুলতিলক প্রতাপসিংহকে অপমানের উত্তর দিয়াছিলেন, তোপের মুখে চিতোর ধ্বংস করিয়াছিলেন। আজ

চিতোরের যে দশা, তাঁহার প্রাণপ্রতিম আম্বেরেরও সেই দশা! কাল, মনুষ্য গর্ব্বের ও পাপের কি ভীষণ পরীক্ষক ও দণ্ডবিধাতা! আম্বেরের দুর্গস্থিত রাজবাটীর শীর্ষকক্ষ হইতে, পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত, ভগ্নগৃহপূর্ণ হত-গৌরব আম্বের, এবং পার্শ্বস্থিত জয়পুর দেখিতে দেখিতে, হৃদয় কি বিষাদে, কি গাম্ভীর্য্যেই পরিপূর্ণ হইয়াছিল! এখনও শৃঙ্গে শৃঙ্গে দুর্গ বিরাজিত। ঠিক্ যেন প্রাণ-শূন্য শব, ঠিক্ যেন বীরপুরুষের দেহ-কঙ্কাল শৃঙ্গে শৃঙ্গে দেখা যাইতেছে। তাহার ভিতর ছিন্ন বস্ত্রে, ভগ্ন অস্ত্রে সজ্জিত, কতকগুলি শৃগালকুক্কুরাধম সৈন্য আছে। দেখিলে লোকের ঘৃণা হইবে। সেই জন্যে, এ সকল দুর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমি এই শৃঙ্গস্থিত দুর্গমালা, গহ্বরস্থিত মৃত নগরের সমাধি এবং জীবিত নগরের চাকচিক্য দেখিয়া ভাবিলাম,—

"ভারতে যেমতি পুরাকালে হায়!
শোভিত আসর আলোকমালায়,
যেমতি গাইত গীত গায়িকায়,
পুরিয়া যামিনী সঙ্গীত সুধায়।
সেই নৃত্যগীত রয়েছে সকল,
কিন্তু কোথা গেল সেই বীর্য্যবল?"

ভাবিতে ভাবিতে চিন্তাবসন্ন হৃদয়ে জয়পুরে ফিরিলাম।

জয়পুর বাঙ্গালীর বড় গৌরবের স্থান। নগরটি অতি সুচারুরূপে নির্ম্মিত ও সজ্জিত। প্রশস্ত রাজপথ সকল জয়পুরকে ঠিক যেন একটি শতরঞ্চ খেলার ঘরের মত বিভক্ত ও সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিমে সরল রেখায় রাজপথ সকল সারি সারি ছুটিয়াছে। দুই দিকে একরূপ দ্বিতল গৃহশ্রেণী।

কি নগর, কি রাজবাটী, হুগলীর বিদ্যাধর নামক জনৈক জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের কল্পনাপ্রসূত। আজও বাঙ্গালী জয়পুরের মন্ত্রী এবং রাজসহায়; তাই বলিতেছিলাম, জয়পুর বাঙ্গালীর বড় গৌরবের স্থান। মহারাজা জয়সিংহ এক জন প্রতিভাসম্পন্ন জ্যোতিষবিৎ ছিলেন। আপন প্রতিভাবলে, নানাবিধ জ্যোতিষ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, ইনি জ্যোতিষ অনুশীলনের জন্যে, স্থানে স্থানে মান-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দিল্লীর বহির্ভাগে এরূপ একটি অদ্ভুত মন্দির ছিল। এই অধঃপতনের দিনে লোকে ইহার নাম 'যন্ত্র-মন্ত্র'—দিয়াছে। জয়পুর রাজবাটীর এক কোণেও এইরূপ একটি প্রশস্ত মান-মন্দির আছে। জয়সিংহের সিংহাসনে এমনি শৃগাল সকল বসিয়া তাঁহার অনির্ব্বচনীয় অবমাননা করিয়া আসিতেছেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের এই অদ্বিতীয় অতুলনীয় গৌরবনিদর্শন সকল সর্ব্বত্র ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। এই হস্তি-মূর্খদের কাছে এতাদৃশ প্রতিভার সম্মান হইবে কেন? যে অর্থ ইঁহারা প্রতিবৎসর ইংরাজের পদসেবায় ব্যয়িত করেন, যে অর্থ বর্ত্তমান 'রামবাগের' মিউজিয়মে ব্যয়িত হইতেছে, তাহার ভগ্নাংশমাত্রে এ সকল সংস্কৃত ও রক্ষিত হইতে পারে। এ কথাটা মহারাজাকে বলিতে আমি সংসার বাবুকে বলিয়াছি। তিনি বলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে উদ্যান নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা যদি আম্বেরের দুর্গের পাদমূলে উপত্যকায় নির্ম্মিত হইত, মিউজিয়মটি যদি প্রথমোক্ত ঝিলের কেন্দ্রস্থলে নির্ম্মিত হইত, তবে পুরাতন আম্বের পুনর্জীবিত হইত, এবং শিল্পের সঙ্গে প্রাকৃতিক শোভা মিলিয়া কি অপূর্ব্ব দৃশ্যেরই সৃষ্টি করিতে পারিত! কিন্তু সে সহৃদয়তা, সে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান, দেশীয়

রাজাদের থাকিবে কেন? তাহা হইলে তাঁহারা ভারতীয় রাজা হইতেন না।

জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজা কায়েম সিংহ সম্বন্ধে গোটা দুই গল্প বলিব। ইনি জয়পুর রাজ্যের এক জন সামান্ত সর্দ্দার ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সহোদরের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ হয়, এবং তিনি রাজ-বিচার অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠের সাহায্যার্থ এবং তাঁহার দমনার্থ রাজসৈন্য প্রেরিত হইলে, ইনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়া বৃন্দাবনে যান, এবং সেখানে ভিক্ষুকের মত সস্ত্রীক থাকেন। এ দিকে অপুত্রক রাজা রাম সিংহ মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হন, এবং কায়েম সিংহের বীরত্বে এবং তেজস্বিতায় প্রীত হইয়া, তাঁহাকে উত্তরাধিকারিত্বে মনোনীত করেন। কায়েম সিংহ, 'মাধো সিংহ,' নাম গ্রহণ করিয়া, জয়পুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অদৃষ্টের আবর্ত্তনে বৃন্দাবনের ভিক্ষুক জয়পুরের মহারাজা হইল। তিনি নির্ব্বাসন সময়ে অসাধারণ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। তিনি তাহার অনেক অদ্ভুত গল্প করেন। এখন যাহারা রাজবাটীর এবং তাঁহার নিজের ভৃত্য ও রাজকর্ম্মচারী, তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়া বলেন, "এই ব্যক্তি ঘুস না পাইলে আমাকে গলায় ধাক্কা দিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে দিত না, এই কর্ম্মচারী ঘুস না পাইলে আমার কারা-বাসী সহচরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দিত না। রাজকর্ম্ম-চারীদের সকলের দোষগুণ আমি জানি এবং রাজনীতি সকল কি কৌশলে ব্যর্থ করিতে পারা যায়, আমি তাহাও জানি," অথচ তিনি সিংহাসনে বসিয়া একটি কর্ম্মচারীকেও কর্ম্মচ্যুত করেন নাই।

একদিন সংসার বাবুকে দেখাইয়া, তাঁহার পরিচারকবর্গের সমক্ষে, সংসার বাবুর ছোট ভাই পূর্ণ বাবুকে বলেন—"তোমার যে এই দাদাটি দেখিতেছ, ইনি বড় সহজ পাত্র নহেন। ইনি স্কুলে আমার শিক্ষক ছিলেন। আমাকে মারিবার জন্য বলিতেন, " 'কায়েম সিংহ! হাত লাও।' আরে! মার খানেকে ওয়াস্তে কোই ক্যা হাত লাতায়? আমি প্রাণান্তে হাত বাড়াইতাম না, এবং উনি মারিতে আসিলে, আমি টেবিলের চারিদিকে ঘুরিতাম। উনি তাড়াইয়া তাড়াইয়া আমাকে মারিতেন। আমি এক এক বার মনে করিতাম, ধরিয়া হাড় গুঁড়া করিয়া দি। এখন করযোড় করিয়া আমার সমক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন। আর এখন যদি আমি বলি, 'হাত লাও!'—বাপ! কি মারটাই আমাকে মারিয়াছে!" সকলে হাসিতে লাগিল। সংসার বাবুও হাসিয়া বলিলেন—"মহা-রাজ! আমি যদি জানিতাম, তুমি জয়পুরের মহারাজ হইবে, আমি তোমাকে আরও বেশী করিয়া মারিয়া শিক্ষা দিতাম।" দেখিলে, যেমন শিষ্য, তেমনি গুরু কি না? এখন তিনি সংসার বাবুকে ছায়ার মত সঙ্গে রাখেন, এবং এক জন সামান্য লোকের ন্যায় যখন তখন কান্তি বাবুর বাড়ী যান। এই দুই গল্পে তুমি লোকটি কি প্রকার চতুর, তেজস্বী ও সহৃদয়, তাহা বুঝিতে পারিবে।

আর কত লিখিব। জয়পুরে দু'দিন রাজভোগ খাইয়াছি, রাজার গাড়ীতে ও হাতীতে রাজার মত সম্মানে রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছি। মহারাজা যদিও তখন জয়পুরে ছিলেন না, তথাপি রোজ সংসার বাবুর বাড়ীতে রাজার পাকশালা হইতে আহারীয় আসিত। রান্নাতে ঝালটুকু যেন বেশি। ভারতীয় রাজারা দিন

দিন ইংরাজ পলিটিকেল দ্বারা যেরূপ অপমানিত হন, ঝাল খাই-য়াই সেই ঝাল নিবারণ করেন। এক দিন মহারাজ গবর্ণর জেনেরেলের ইভিনিং পার্টিতে গিয়াছেন। আমাদের দেশের এক জন বিলাসী, ইংরাজপছন্দ, সাহেবী ধরণের মহারাজাকে, সেখানে সুরাপান করিতে ও কেক খাইতে দেখিয়া, সংসার বাবুকে বলিলেন, "ইহার বাড়ীতে কি খাওয়া মেলে না? এখানে ঝুটা খাইয়া বেড়াইতেছে কেন?"

পুষ্কর।

কাল প্রাতে আজমীর পঁহুছিয়া পুষ্কর দেখিতে যাই। পুষ্কর যেমন মনে করিয়াছিলাম, তেমন কিছুই নহে। গোবর্দ্ধনের মত একটি নৈসর্গিক সরোবর মনে কর। গোবর্দ্ধন হইতে কিঞ্চিৎ বড় হইলেও, দেখিতে তেমন মনোহর নহে। সেইরূপ একটি ঝিল। তাহার দুই পার্শ্বে সারি সারি অট্টালিকা। অন্য দুই দিকে অট্টালিকাশ্রেণী কিছু বিরল। কিঞ্চিৎ দূরে, চারি দিকে রাজ-গিরের পাহাড়ের মত পাহাড় তরঙ্গিত ভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জলের বর্ণ নীল, কিন্তু এত ময়লা যে, ব্রহ্মা তাঁহার যজ্ঞের উপযোগী মনে করিয়া থাকিলেও, আমি তাহা কোনও মতে স্পর্শ করিতে মনে প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিলাম না। তারা-চরণ পাঁচ ডুব দিয়াছেন, যদি কিছু পুণ্য হইয়া থাকে, অবশ্য আমি তাহার অংশ পাইব। কারণ, তারাচরণ আমাকে যেরূপ

ভালবাসে, স্বর্গের ভাগ দিতেও কখন কাতর হইবে না। পুষ্ক-রের মধ্যস্থলে, একখানি উপলখণ্ডের উপর, জনৈক মকর মহাশয় নিদ্রা যাইতেছিলেন, কি তপস্যা করিতেছিলেন, বলিতে পারি না। যজ্ঞ-জলে তাঁহারও যেন অতৃপ্তি হইয়াছে, কারণ আমরা যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণ তিনি নিশ্চল ছিলেন; একটি বারও জলে নামিলেন না।

পুষ্কর দর্শন করিয়া, একখানি ক্ষুদ্র খাটুলি চড়িয়া, সাবিত্রী দেবীর দর্শনলাভ করিতে পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতে আরোহণ করি। খাটুলি সামান্য দড়ির বন্ধন, স্থানে স্থানে ঠক ঠক করিয়া পাথরে লাগিতেছিল, আর আমি ভাবিতেছিলাম, ভারতভ্রমণ বুঝি এই-খানেই শেষ হইল। প্রায় এক ঘণ্টাকাল আরোহণ করিবার পর, আমরা মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। একটি ক্ষুদ্র মন্দির। দুটি শ্বেত প্রস্তরের মূর্ত্তি—সাবিত্রী ও সরস্বতী। দুটি মূর্ত্তিই যেন জৈন বলিয়া বোধ হইল। পর্ব্বতশিখর হইতে দৃশ্যটি মনোহর, কিন্তু কঠোর। শ্রেণীর পর শ্রেণী বাঁধিয়া বন্ধুর পর্ব্বতমালা শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে মাড়োয়ারের বন্ধুর উপত্যকা, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে ও শস্যক্ষেত্রে বিচিত্রিত। পাদমূলে পুষ্কর ও বাপীতীরস্থিত নগর, শ্বেত পুষ্পে পুষ্পিত, একটি মনোহর উদ্যা-নের মত শোভা পাইতেছে। কিন্তু, চন্দ্রশেখরের দৃশ্যের কাছে ইহা কিছুই নহে।

অবতরণসময়ে ব্রহ্মার মন্দির দর্শন করি। লোকটি নিতান্ত অরসিক ছিলেন না, তাঁহারও শুক্লপক্ষের ও কৃষ্ণপক্ষের দুই বনিতা। সাবিত্রী দেবীর যজ্ঞে আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখিয়া, তিনি নবযৌবনসম্পন্না 'বালস্ত্রী' গায়ত্রী দেবীকে বিবাহ করেন।

সাবিত্রী দেবীও আমাদের বঙ্গলক্ষ্মী, তিনি চটিয়া লাল। পাহাড়ে চড়িয়া নব দম্পতীকে অভিশাপ দিলেন যে, তাঁহার চরণধৌত জল তাঁহাদের মস্তক পাতিয়া লইতে হইবে। বড় বেজায় কথা! স্বয়ং ব্রহ্মার যদি এই দশা হয়, তবে আমরা গরিব কোথায় যাই? মন্দিরে ব্রহ্মার শ্বেতপ্রস্তরের চতুর্মুখ মূর্ত্তি এবং পার্শ্বে সেই ছোট ঠাকুরাণী। বুড়া এত চোটের পরও নব যৌবনের মায়া ছাড়িতে পারে নাই!

মোট কথা, পুষ্কর সত্যযুগে বোধ হয় একটি অতি মনোজ্ঞ ও অতি পবিত্র স্থান ছিল। শৈলমালাবেষ্টিত একখণ্ড গভীর নির্ম্মল সলিল দর্পণ, তাহার চারি পার্শ্বে বৃক্ষলতাশোভিত, নানাবিধ পক্ষীর কলগানে মুখরিত, এবং যজ্ঞধূমে সমাচ্ছন্ন, আশ্রমাবলী হইতে বেদধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে; দৃশ্যটি না জানি কি পবিত্র, কি হৃদয়গ্রাহী ছিল। যদি ইউরোপীয় কোন জাতির তীর্থ স্থান হইত, তবে পুষ্কর আজ ঠিক সেইরূপ দেখিতে পাইতাম। সেই দৃশ্যটির সৃষ্টি করা বড় বেশী ব্যয়সাধ্যও নহে। ইহার চারিদিকে এখনও কত হিন্দু রাজা আছেন! কিন্তু তাঁহারা এরূপ মহা-পাতক করিবেন কেন?

ফিরিয়া আসিয়া, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, আজমীরস্থ বিখ্যাত ফকিরের দরগা দেখিতে যাই। ইনিই কুক্ষণে আমাদের ভারত-বর্ষে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যে প্রথম প্রবেশ করেন। পার্শ্বে জৈনদিগের একটি অতি বৃহৎ, অতি প্রশস্ত, এবং মনোহর কারুকার্য্যে খচিত দেবালয় ছিল। মহম্মদ ঘোরি আজ্ঞা প্রচার করেন যে, এই মন্দিরে তিনি জুমার নমাজ পড়িবেন। জুমার ২॥ দিন বাকি। ২॥ দিবসের মধ্যে হিন্দুর দেবালয় ভগ্ন করিয়া

কথঞ্চিৎ মসজিদের আকৃতি করা হয়। ইহার নাম সেই জন্ম ২॥ দিনের ঝোপরা। সেই দেবালয়ের প্রাচীর, স্তম্ভ, ছাদ, কারুকার্য্যে এখনও শোভা পাইতেছে। বোধ হয়, এই দেবালয়ের প্রস্তরের দ্বারা পার্শ্বস্থিত দরগা নির্ম্মিত হয়। কবরের চারিদিকে রূপার রেলিং। প্রশস্ত প্রাঙ্গণের এক সীমাতে বাদসাহ আকবর ও সাহাজান নির্ম্মিত মসজিদ, দেওয়ান-খাস ইত্যাদি গৃহ বর্ত্তমান আছে। প্রবাদ, সমস্ত একটি শিবালয় ছিল। কাপুরুষের দেবতাও কাপুরুষ হইয়া থাকে। কালা পাহাড়ের ভয়ে শিব পাতালে প্রবেশ করেন। মুসলমানেরা বলেন, ফকির এই পথে তিরোহিত হইয়াছিলেন। এই দরগাতে দুটি প্রকাণ্ড তামার ডেক, দুটি ইষ্টকনির্ম্মিত চুল্লির উপর বিরাজ করিতেছে। দেখিতে যেন এক একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। ১৫০০৲ এবং ৯০০৲ টাকা ব্যয় করিলে, ইহার এক একটিতে খিচুড়ী পাক হয়, এবং লোকেরা কম্বল জড়াইয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া তাহা লুটিয়া খায়।

একটি শোক-ইতিহাস ইহার সঙ্গে জড়িত আছে। আলা উদ্দিন চিতোর জয় করিয়া, এক জোড়া রজত-খচিত চন্দনের কপাট, একটি পিত্তলনির্ম্মিত প্রদীপের বৃক্ষ বা ঝাড়, এবং দুইটি নাকাড়া এখানে আনিয়া, তাহার বিজয়পতাকা চিহ্ন-স্বরূপ প্রকাশ্য স্থানে রাখে। তাহা এখনও আছে। অপমানে, অভি-মানে, চিতোরাধিপতি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে পর্য্যন্ত তাহা উদ্ধার করিতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত মেবারেশ্বর আজমীরে প্রবেশ করিবেন না। তিনি বহু যুদ্ধেও এই প্রতিজ্ঞাপালন করিতে পারেন নাই। রাজপুতানার সেই সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, তথাপি, উদয়পুরের রাণা একবার ইংরাজ কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া

এখানে আসিয়াও নগরের বাহিরে ছিলেন, মধ্যে প্রবেশ করেন নাই।

রাজপুতানার এই অধঃপতন, হিন্দুধর্ম্মের এই দুর্গতি, তারাগড় নীরবে শৈলসানু হইতে চাহিয়া দেখিতেছেন। ঐ দুর্গ পৃথ্বীরাজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহার তোরণে এখন বৃটিশ বৈজয়ন্তী উড়িতেছে।

অদ্য প্রাতে আনা-সাগর দেখিতে যাই। আনা নামক রাজা, নদী স্রোত বন্ধ করিয়া, এই সাগর সৃষ্টি করেন। ইহার তিন দিকে শৈলমালা, এক দিকে উক্ত বাঁধ এবং তদুপরি ভগ্ন হিন্দু রাজভবনের উপর মোগলদিগের রাজপ্রাসাদাবলী বিরাজিত রহিয়াছে। ইহার শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত দেওয়ানআমে, জাহাঙ্গীর প্রথম ইংরাজ রাজদূত সার টমাস রোয়ের সঙ্গে কুক্ষণে সাক্ষাৎ করেন। এইরূপে এইখানে দুইটি সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়, ভারতের দুইটি মহা কুদিন এখানে আমাদের অদৃষ্টগগনে সঞ্চারিত হয়। সেই সকল শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকাতে এখন কমিসনর বিহার করিতেছেন, এবং তাহাতে তাঁহার আফিস ও মিউনিসিপাল আফিস বিরাজ করিতেছে। জগতের কি বিচিত্র গতি! বাদসাহরমণীদের ক্রয়-বিক্রয় করিবার জন্যে যে "মিনাবাজার" ছিল, এখন তাহা উদ্যানের কুলির নিবাস!

একটি বড় সুন্দর গল্প শুনিলাম। এই উদ্যানের ও সাগরের উপরিস্থ এক অত্যুচ্চ শিখরে রাজপুতানার এজেণ্টের উপনিবাস। একদা তিনি এখানে পদার্পণ করিলে, সৌধচূড়ায় তাঁহার বৈজয়ন্তী উড়িল। কিন্তু ততোধিক উচ্চ শৈলে, হনুমানজীর আস্তানায়, তাঁহার বৈজয়ন্তী উড়িতেছে। রাজপুরুষ তাহা সহিতে পারিলেন

না। তিনি আস্তানার সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া বলিলেন যে, রাজ-প্রতিনিধির বৈজয়ন্তী অপেক্ষা হনুমানের বৈজয়ন্তী উর্দ্ধে থাকিতে পারিবে না। সন্ন্যাসী হনুমানের চেলা, তাহার কিঞ্চিৎ বীরত্ব থাকিবার কথা। সে বলিল, রাজপ্রতিনিধির অপেক্ষা ঈশ্বরের বৈজয়ন্তী ত উর্দ্ধে উড়িবেই, তাহাতে আবার আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

চিতোর

এ পত্রে চিতোরের কথা লিখিব। কারণ, চিতোরের কথা তুমি শুনিতে বোধ হয় নিতান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছ। কিন্তু কি লিখিব? চিতোরের নাম করিতেই আমার হৃদয় কি শোকের ও স্মৃতির উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয়, তাহা বলিতে পারি না।

নিশীথসময়ে চিতোর ষ্টেসনে উপস্থিত হই। আমাদিগকে ডাকবাঙ্গালা দেখাইয়া দিবার জন্য, ষ্টেসনে একটি লোক চাহিলাম। শুনিলাম যে, এই অল্প পথটুকু যাইতেই পথে এত 'ভেঁড়িয়া' (নেকড়ে বাঘ) যে, গলায় কামড়াইয়া ত ধরেই, তাহা ঝাড়া, "ছোড়্‌তা বি নেহি।" কেহ প্রাণান্তে যাইতে স্বীকার করিল না। ইহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে, কি বীর-ভূমি, কি অরণ্য ও কাপুরুষের বাসভূমি হইয়াছে। কাযে কাযেই সে রাত্রি, ষ্টেসনের মেজেতে পড়িয়া কাটাইলাম। প্রাতে চিতোরস্থ 'হাকিমে'র নিকট হইতে হস্তী এবং পাশ লইয়া আমরা দুর্গ

দর্শন করিতে যাই। দুর্গপদমূলে এখনও একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামটি পার হইয়া আমরা চিতোরশৈলে আরোহণ করিতে আরম্ভ করি। আরাবলী গিরিশ্রেণী হইতে একটি পর্ব্বত স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। তাহাই চিতোর দুর্গ। অতি প্রশস্ত পথ, ঘুরিয়া শৈলশেখরে উঠিয়াছে। পর্ব্বতটি রাজগিরের পর্ব্বতের মত প্রস্তরময়। ক্রমে পদ্মদ্বার, হনুমানদ্বার, গণেশ দ্বার, দুটি ঝুলনদ্বার, সূর্য্যদ্বার, সর্ব্বশেষে পুরদ্বার অতিক্রম করিয়া, প্রায় এক ঘণ্টা-কাল আরোহণের পর, সানুদেশে উপস্থিত হই। সানুদেশ উত্তর দক্ষিণে মাইল তিন দীর্ঘ, এবং এক মাইল সমতলভূমি। ইহার উভয় পার্শ্ব হইতে মধ্যস্থল ঈষৎ নিম্ন। তাহাতে নানা স্থানে জলাশয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই প্রশস্ত সানুদেশ বেষ্টিয়া দুর্গ-প্রাচীর এবং প্রাচীরের মধ্যে লক্ষ বীরপুরুষের পুণ্যধাম চিতোর নগর অবস্থিত ছিল। এখন তাহার ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। চিতোর এখন একটি মহাশ্মশান। এখনও স্থানে স্থানে তৈল-কুণ্ড, ঘৃতকুণ্ড ইত্যাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যুদ্ধের সময় তাহা পূর্ণ রাখা হইত। হায়! হায়! আজ সেই বীরনগর, সেই বীরপুরুষ সকল কোথায় গেল?

আমরা প্রথমে মাতা পদ্মিনী দেবীর আবাসস্থান দেখিতে যাই। শুনিলাম, তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল না। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ সজ্জন সিংহ এক জন প্রকৃত সজ্জন ছিলেন। তিনি চিতোরের ঐতিহাসিক স্থানগুলির পুনর্নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী তাহা বন্ধ করিয়াছেন। সজ্জন সিংহ পদ্মিনীর আবাসস্থানের ভিত্তি খুঁজিয়া কয়েকটি দেওয়াল তুলি-য়াছেন এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র কক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন।

অট্টালিকাশিরে স্ফটিকের নক্ষত্র, সতীত্বের ধ্বজার মত, সূর্য্যালোকে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র সরোবরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ। পদ্মিনী দেবী তাহাতে ক্রীড়া করিতেন। যে সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্বমাত্র দিল্লী উন্মত্ত করিয়াছিল, সেই ঘোরতর শোকনাটক ঘটাইয়াছিল, যাহার জন্যে এত বীরগণ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের উপবীত পরিমাণে ৭৪॥৹ মণ হইয়াছিল; সেই সৌন্দর্য্যের এইমাত্র স্মৃতিচিহ্ন চিতোরে বিদ্যমান রহিয়াছে!

পদ্মিনীর মহল দর্শন করিয়া আমরা 'কালী মাইর' মন্দির দেখি। একটি শ্বেতপ্রস্তরের মূর্ত্তি, তাহার পার্শ্বে একটি কৃষ্ণপ্রস্তরের মূর্ত্তি। প্রথমটি জৈন বলিয়া বোধ হইল। মন্দিরটিও যেন জৈনমন্দিরের 'প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত বোধ হইল। মূর্ত্তি দুইটির ইতিহাস কেহ কিছুই জানে না। এই কুলাঙ্গারদের অপেক্ষা চিতোরের ইতিহাস আমরা অধিক জানি। এই মন্দিরেই সেই চিতোরেশ্বরী কালী ছিলেন। তিনিই স্বপ্ন দেখাইয়াছিলেন—"মঁয় ভুখা হো!" হায় মা! এখন কি তোমার ক্ষুধা নিবারণ হইয়াছে? আজ যে চিতোরের কয়েকটি কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে!

তাহার পর, মীরা বাইয়ের নির্ম্মিত মন্দির ও তাহাতে স্থাপিত রাধাকৃষ্ণের মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, আমরা কুম্ভরাণার কীর্ত্তিস্তম্ভে আরোহণ করি। এই স্তম্ভটি আমার কাছে সর্ব্বপ্রশংসিত, কুতুব মিনার বা পৃথ্বীরাজের স্তম্ভ অপেক্ষা অধিক মনোহর বোধ হইল। স্তম্ভটি উপর্য্যুপরি নয়টি প্রকোষ্ঠ দ্বারায় নির্ম্মিত। কুতুব মিনারে ক্রমাগত কেবল সোপান বাহিয়া

উঠিতে হয়। এই স্তম্ভের এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে উঠিয়া, প্রকোষ্ঠ প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহার পর আবার সোপান আরোহণ করিতে হয়। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে এক একটি দেব দেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। দিল্লীশ্বরকে উপর্য্যুপরি পরাজয় করিয়া, মহাবীর কুম্ভরাণা এই কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

তাহার পর যে স্থান দর্শন করিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। স্থানটির নাম গোমুখী। গিরিপার্শ্বে দেব দেবীর মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ একটি অতি সুন্দর কক্ষ। তাহার পশ্চাৎ পার্শ্ব দিয়া, চন্দ্রশেখরের মন্দাকিনীর মত, দুইটি নির্ঝরধারা প্রবাহিত হইয়া, সম্মুখস্থ প্রস্তরনির্ম্মিত সরোবরে পড়িতেছে। নির্গমপথ বন্ধ করিলে সরোবরটির মুখে মুখে জল হয়। সমস্ত স্থানটি বৃক্ষচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। শীতল, নির্জ্জন এবং শান্তিপ্রদ এমন স্থান আমি যেন দেখি নাই। রাজপুরী হইতে একটি গুপ্ত পথ, পর্ব্বতের অভ্যন্তর দিয়া এখানে আসিয়াছে। রাজমহিষীরা এই পথ দিয়া আসিয়া অবগাহন করিতেন এবং দেব দেবীর পূজা করিতেন। মূর্খ স্থানদর্শক আমাদিগকে বলিল, এই সুড়ঙ্গের মধ্যে "জোহর" হইত; যুদ্ধাবশেষে ইহাতেই বীরনারীরা পুড়িয়া মরিতেন। আমি তাহা বিশ্বাস করিলাম না। অনেক জিজ্ঞাসার পর বলিল, রাজপুরীর মধ্যে এই সুড়ঙ্গের অন্য মুখ আছে। আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখানে গেলাম। ইহা টড সাহেবের বর্ণনার সঙ্গে মিলিল। এই সেই পর্ব্বতাভ্যন্তরীণ কক্ষের পথ, যাহাতে সহস্র সহস্র বীরনারীরা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, জগতের বিস্ময়কর সতীত্বের এবং সাহসের জলন্ত ও জীবন্ত প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার ভিতর

প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। শুনিলাম, বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি এই পবিত্র স্থানকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম এবং ললাটে ইহার ধূলা মাখিলাম। এইটি আমাদের একটি প্রকৃত মহাতীর্থ।

হায়! হায়! কি কুলাঙ্গারেরা, কি হৃদয়হীন নরাধমেরা, কি শৃগালেরাই সিংহদিগের আসনে বসিয়াছে। যদি এই চিতোর ইংরাজদিগের কোনও রূপ ঐতিহাসিক ক্ষেত্র হইত, আজ সেই পদ্মিনীর পবিত্র আবাসগৃহ, সেই রাজপুরী, আমরা একটি বৃহৎ উদ্যানে বিরাজিত দেখিতাম। সেই পবিত্র জোহর-কক্ষ, আজ শত আকাশ-গবাক্ষে আলোকিত হইত, কক্ষটি ঐতিহাসিক চিত্রে সজ্জিত হইত। আমরা চিত্রে দেখিতাম, সময়ে সময়ে কিরূপে বীরনারীরা সহস্রে সহস্রে অগ্নি প্রবেশ করিতেছেন, দেখিতাম, একস্থানে চিতোরেশ্বরী কাণপুরস্থ সেই স্বর্গীয়া দেবীর ন্যায় দাঁড়াইয়া, অধোবদনে রোদন করিতেছেন। চিতোরের অঙ্গে অঙ্গে তাহার ঐতিহাসিক গৌরব সকল স্বর্ণ-অক্ষরে লিখিত থাকিত। তুমি জান, প্রতাপসিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যত দিন দিল্লী জয় করিয়া তিনি চিতোর অধিকার করিতে না পারিবেন, তত দিন তিনি তৃণে ভিন্ন শয়ন করিবেন না, পত্রে ভিন্ন আহার করিবেন না। শুনিলাম, তাঁহার অযোগ্য উত্তরাধিকারিগণ এখনও স্বর্ণশয্যার নীচে তৃণ রাখিয়া শয়ন করেন, স্বর্ণপাত্রের নীচে পত্র রাখিয়া আহার করেন। সেই বীরপ্রতিজ্ঞা এখনও তাঁহারা ভুলেন নাই। তথাপি, চিতোরের পদ্মিনীর, চিতোরের প্রতাপসিংহের, প্রাণপ্রতিম চিতোরের আজ এই অবস্থা! এটি যে চিতোর, তাহা পথিককে বলিয়া দিবার জন্য

একটি অঙ্গুলি নির্দ্দেশমাত্র কোথাও নাই। আছে—ইতিহাসে আছে। তারাচরণ বলিলেন, "রক্তধমনী-বিশিষ্ট প্রস্তররাশিতেও যেন সেই বীরপুরুষদের শোণিতধারা বর্ত্তমান আছে।" আছে বলিয়াই আমি দরিদ্র দুর্ব্বল বাঙ্গালী এই মহাতীর্থ দর্শন করিতে চিরজীবন লালায়িত ছিলাম। আজ দেখিয়া জীবন সার্থক মনে করিলাম। চিতোর অমর, চিতোর ঊনবিংশ শতাব্দীর কুরু-ক্ষেত্র। চিতোর ভারতের ভবিষ্যৎ আশা। সে বীরত্ব, সে সতীত্ব ভিন্ন ভারতের অন্য আশা নাই।

প্রায় ১টার সময়ে অবরোহণ করিয়া আসি। উদয়পুরের জনৈক মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীর পাচক মহাশয়, আমাদের জন্যে বীরত্বপূর্ণ আহার প্রস্তুত করিতেছিলেন। একদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাউল; অন্যদিকে তদুপযোগী কলাইয়ের ডাল। কোন-টাই সিদ্ধ হয় নাই।

যোধপুর।

ভগবানের কৃপায়, বড় সুখে বড় সম্মানে, যোধপুর দর্শন করিয়া আসিলাম। কাল যে কার্ড লিখিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছ, যোধপুরের এসিষ্টাণ্ট্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পণ্ডিত জীবানন্দের সহিত লাহোর যাইবার সময়ে রেলে সাক্ষাৎ হয়। আর একটি লোক অম্বালার কমিশরিয়েটর ছিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার আলাপের পর, তাঁহারা এত প্রীত হন যে, উভয়ে আমাকে অম্বালা ও যোধপুরে যাইতে নিতান্ত অনুরোধ করেন। অম্বালায় যাইতে পারিলাম

না। যোধপুরে পণ্ডিত জীবানন্দের কাছে টেলিগ্রাফ করি। ষ্টেসনে পৌছিয়া দেখি, রাজার বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বাবু হরিশ-চন্দ্র মিত্র, মান্দ্রাজ 'এথিনিয়ম' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, আমার অপেক্ষা করিতেছেন। পণ্ডিতের বাড়ী পঁহুছিয়া দেখি; আমার অভ্যর্থনার জন্যে একটি কক্ষ সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি এবং রাজার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হরদয়াল সিংহ—ইনি কাউন্সেলেরও মেম্বর—এক বাড়ীতে থাকেন। ইহারা দু'জন যে কি আদর করিলেন, বলিতে পারি না। দুই বেলা পরিপাটি আহার। বসিতে হয় আসনে, কিন্তু থাল থাকে একখানি অতি সুন্দর চৌকির উপর। থাল রূপার, তাহার উপর সমুদয় রূপার বাটি সাজান রহিয়াছে। চামচ দিয়া তর-কারী লইয়া খাইতে হয়। রান্না পঞ্জাবী ধরণের। কারণ, ইহারা পঞ্জাবী।

সন্ধ্যার সময়ে, হরদয়াল সিংহ আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া, রাজার ভ্রাতা ও মন্ত্রী কর্ণেল সার প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান। আমরা জানিতাম যে, কেবল নরাধম সিবি-লিয়ানগুলোই বুঝি খোসামুদির প্রিয়। কিন্তু দেখিলাম, এ রাজাদের কাছে তাহারা কোথায় লাগে! হরদয়াল সিংহ আমাকে ইহার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। আমি যদিও-এ কার্য্যে অনভ্যস্ত, তথাপি সেই সুরে বীণা বাঁধিয়া আলাপ করিলাম। তিনি এত সন্তুষ্ট হন যে, অপরাহ্নে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার অশ্বা-রোহী সৈন্যের ব্যায়াম দেখিতে বলেন। আমি নূতন রাজবাড়ী দেখিতে যাই। সম্মুখের একটি বাড়ীতে—এটিই শ্রেষ্ঠ অট্টা-লিকা—শুনিলাম, রাজার উপপত্নী থাকেন এবং রাজা দিন

রাত্রি এখানেই পড়িয়া থাকেন। তাহার পশ্চাতে অন্তঃপুর-মহল। তাঁহার মহিষী কয়েক জন তাহাতে আবদ্ধ আছেন। রাজকার্য্যের সম্যক্ ভার প্রতাপসিংহের হস্তে, তিনিই প্রকৃত রাজা। নূতন বাড়ী, আমাদের চক্ষে কিছুই লাগিল না। তবে নূতন যে একটি কার্য্যালয়বাড়ী হইতেছে, তাহা অতি জাঁকাল রকমের। ফিরিয়া আসিয়া, প্রতাপসিংহের কাছে বসিয়া অশ্ব-ক্রীড়া দেখি। মাড়ওয়ার রাজ্যের সর্দ্দারদিগের শিশুদিগকে পর্য্যন্ত তিনি অশ্বারোহণে শিক্ষা দিতেছেন। খোকার অপেক্ষা ছোট ছোট শিশুরাও নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ছুটাইতেছে। প্রতাপ-সিংহকে দেখিলে, রাজপুতকুলতিলক হিন্দুগৌরবসূর্য্য প্রতাপ-সিংহকে মনে পড়ে। লোকটি দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু তেজ যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। শুনিলাম, ইনি জীবন্ত ব্যাঘ্রের দন্ত উৎপাটন করেন! তাঁহার ডান হাতে এক ব্যাণ্ডেজ এবং ডান পায়ে অন্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রহিয়াছে। তদ্রূপ, তাঁহার পারিষদবর্গেরও হস্তে, পদে, চক্ষে, ব্যাণ্ডেজ শোভা পাইতেছে। সকলেই ঘোড়া হইতে পড়িয়া আহত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিবে যে, ইহারা কিরূপ অশ্বারোহণে ব্রতী। সন্ধ্যার পর, জ্যোৎস্নালোকে আবাসে ফিরিয়া আসি।

পরদিবস প্রাতে যোধপুরের দুর্গ দেখিতে যাই। একটি প্রায় চন্দ্রনাথের মত উচ্চ শৈলের সর্ব্বাঙ্গ এবং এক পার্শ্বের উপত্যকা আবৃত করিয়া দুর্গপ্রাচীর চলিয়া গিয়াছে। উপত্যকায়, যোধ-পুরের গৃহাবলী অসংখ্য হংসমালার মত শোভা পাইতেছে। শৈলশৃঙ্গ ব্যাপিয়া দুর্গের অট্টালিকা। এই দুর্গ ও নগর, তুমি জান, যোধাসিংহ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাই ইহার নাম

যোধপুর। শৈলশেখর যেরূপ স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, সেই রূপ স্তরে স্তরে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে ; তলার উপর তলা উঠিয়া, গগনস্পর্শী বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিতেছে। ইহার কক্ষগুলি অনতিবিস্তৃত, কারণ তাহারা পুরাতন, কিন্তু সুচিত্রিত ও সুসজ্জিত। তবে ইংরাজি সাজ সজ্জার তত বাড়াবাড়ি নাই! একটি কক্ষে রজত-দোলা রজত-শৃঙ্খলে দুলিতেছে। তাহার পশ্চাতে এক বিরাট আরসি। যখন যোধপুরাধিপতি এই দোলায় দুলিতে থাকেন, ভুবনমোহিনী মহিষীগণ কেহ বা অঙ্কে বসিয়া আছেন, কেহ বা চন্দ্রকে ঘেরিয়া তারামালার মত চারিদিকে দোলা আলো করিয়া বসিয়া আছেন, কেহ বা অলঙ্কার-ঝনৎকারে কক্ষ পূর্ণ করিয়া তালে তালে'দোলাইতেছেন, দুলিতেছে রূপসী, দোলা-ইতেছে রূপসী, তখন কি প্রতিবিম্বই না জানি আরসীতে প্রতি-ভাত হয়! ইচ্ছা হয়, আরসী হইয়া একবার সে রূপতরঙ্গের প্রতিবিম্বমাত্রও অনুভব করিয়া জীবন সার্থক করি। চটিতেছ না ত? কিন্তু কি নরকুলাঙ্গারই যোধার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। এহেন রাজপুরীতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি কতকগুলা অশ্বশালার মত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে উপপত্নী লইয়া বিরাজ করিতেছেন, রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কও নাই।

দুর্গদ্বারে কি পবিত্র দৃশ্য! রাজপত্নীগণ সহমরণে যাইবার সময় হস্তে যে চন্দন মাখিয়া স্বামীর শবের সঙ্গে দুর্গের বাহিরে শ্মশানে যাইতেন, দুর্গের বাহির হইবার সময়ে, তাহার দুই পার্শ্বের প্রাচীরে পবিত্র করপদ্মের চিহ্ন রাখিয়া যাইতেন। আমাদের সঙ্গে 'পাওনিয়ারের' সংবাদদাতা একটি সাহেব

ছিলেন। তিনি গণিলেন, এরূপ ৩২টি কর-চিহ্ন আছে। কিন্তু আহা! কি অযত্নে পড়িয়া আছে। আমাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। আমি সাহেবটিকে বলিলাম—"তোমার 'পাওনিয়ার' পত্রিকা আমাদিগকে অজস্রধারায় গালি দিতে পারে, কিন্তু এই যে পুরাতন ঐতিহাসিক কীর্ত্তি ধ্বংস হইয়া যাইতেছে; এই যে পবিত্র আত্মবিসর্জ্জনের নিদর্শন সকলের একটি টেবলেট্ মাত্রও নাই, ইহার প্রতি কি তোমাদের কখনও চক্ষু পড়ে না? কোন্ কোন্ সাধ্বী এরূপে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামের একটি তালিকা ও ঘটনার কাল, এস্থানে কি রাখা কর্ত্তব্য নহে? এ স্থানটি একটি পবিত্র তীর্থের মত কি রক্ষিত হওয়া উচিত নহে? এই দুর্গে কত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার অঙ্গে কি সে সকল লিখিত থাকা উচিত নহে?" সাহেব লজ্জিত হইয়া বলিলেন, এই প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, যে এরূপে তাঁহার চক্ষু খুলিয়া দিল। তিনি ১৩ বৎসর ভারতে কাটাইয়াছেন, কই, কেহ ত এরূপ কথা বলেন নাই। তিনি এখন ভারত ছাড়িয়া যাইতেছেন, তথাপি ইহা ভুলিবেন না। তিনি এত প্রীত হইলেন যে, বরদার সহকারী মন্ত্রীর কাছে, আমার সাহায্যের জন্যে, এক পত্র দিলেন, এবং বম্বে গেলে, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে অনেক করিয়া বলিলেন। রাজার জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারী, এরূপ কথা শুনিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং এ বিষয়ে তিনি মনোযোগী হইবেন, বলিলেন। তাহার পর, সেই তিন সহস্র ফুট উচ্চ শৈলশেখরের উপরে অশ্ব-পদাঘাতে প্রস্তরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তুলিয়া, আমরা রাজার প্রকাণ্ড একখানি যুড়িতে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

আসিবার সময়ে পণ্ডিত জীবানন্দ, শ্বেত-প্রস্তরের দুই সেট চার পেয়ালা ও রেকাবি দিলেন। তাঁহার এবং হরদয়াল সিংহের ফটোগ্রাফ দিলেন। উক্ত সাহেব এবং হরিশ বাবু রাজার ঘুড়িতে আমাদিগকে ট্রেণে উঠাইয়া দিলেন। ষ্টেসনে আবার প্রতাপ সিংহের সঙ্গে দেখা। তাঁহার এক জন শরীররক্ষককে দিল্লীর সৈন্য-ব্যায়ামে যোগ দিবার জন্যে পাঠাইতে আসিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, তুমি যোধপুরে অতি অল্প সময় থাকিয়া চলিয়া যাইতেছ, আবার আসিও। আমি বলিলাম, আপনার অনুগ্রহ থাকিলে আসিতে পারি। যাহা লিখিলাম, তাহাতে বুঝিবে, কি সুখে ও সম্মানে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে যোধপুর দর্শন করিয়া গেলাম।

তারাচরণ বলিতেছেন, আমি লিখিতে ভুলিয়াছি যে, যোধপুর দুর্গে এক সুবর্ণরঞ্জিত কক্ষ ও সুবর্ণ ও রজতে নির্ম্মিত সিংহাসন দেখিয়াছি।

বরদা।

আমরা জয়পুর হইতে আজমীর, পুষ্কর, চিতোর, এবং যোধপুর—ইহাদের বিষয় পূর্ব্বে লিখিয়াছি—দর্শন করিয়া, বরদায় যাই। বরদার সহকারী দেওয়ান বা মন্ত্রী, আমাদিগকে তাঁহার অতিথির মত গ্রহণ করেন। তারাচরণ সঙ্গে বলিয়া, আমি আপা সাহেব রোডের ধর্ম্মশালায় অবস্থান করি। সহকারী মন্ত্রী মনিভাই যশোভাই, আমাকে অনেক অনুযোগ করেন যে,

পূর্ব্বে তাঁহাকে কোনও সংবাদ দিই নাই। তাহা হইলে তিনি আমাদের জন্যে যথোচিত বাসস্থান নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন। রাজার গাড়ী, রাজার সিপাই ও কারকুন, আমাদের জন্যে নিয়োজিত হয়। আমরা অতি সম্মানের সহিত বরদা দর্শন করি।

বরদায় দেখিবার জিনিস দুই। রাজবাড়ী এবং গুর্জ্জরী। গুর্জ্জর ও গুজরাটের কামিনীকুসুমের সৌন্দর্য্যের গীত সময়ান্তরে লিখিব। বরদার মহারাজাকে গাইকোয়ার বলে। অর্থ, গাভীরক্ষক। গো ব্রাহ্মণ এক। অতএব, রাজার উপাধি গাভীরক্ষক বলিয়া এক জন ব্যাখ্যা করিলেন। আমার বোধ হয়, মহারাষ্ট্র ভূপতির গাভীরক্ষক ছিলেন বলিয়া, গাইকোয়ার নাম হইয়াছে। তেমনি তাঁহার মন্ত্রী বা পেশকার ছিলেন বলিয়া, সেতারা এবং পুণার রাজার নাম পেশোয়া ছিল। শিবজীর উত্তরাধিকারীরা হীনবল হইলে, পেশোয়া এবং গাইকোয়ার স্বাধীন নরপতি হন। আমার এ অনুমান কত দূর সত্য, জানি না। বর্ত্তমান রাজার নাম জিয়াজী গাইকোয়ার। ভূতপূর্ব্ব গাইকোয়ার জনৈক 'পলিটিকেলে'র বিষচক্ষে পড়েন, এবং তাঁহার চক্রান্তে রাজ্যচ্যুত হইলে, তাঁহার দূরসম্পর্কীয় একটি দরিদ্র বালককে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই বৃহৎ রাজ্যের অধিকারী করেন। ইনিই বর্ত্তমান গাইকোয়ার। বরদা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে 'মাখনপুরা' রাজবাটী নামক এক বৃহৎ রাজপুরী আছে। খাণ্ডেরাও গাইকোয়ার এখানে পাশাপাশি দুইটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান গাইকোয়ার তাহার পার্শ্বে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া আর একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া এখানে বাস করিতেছেন।

নগরের মধ্যে আর এক রাজবাড়ীতে অন্যান্য রাজমহিলারা বাস করেন। মাখনপুরার তিনটা অট্টালিকা এক শৃঙ্খলে গাঁথা, এবং আবরিত এক গৃহপথ দিয়া নূতন অট্টালিকা হইতে পুরাতন অট্টালিকাতে যাইতে পারা যায়। পুরাতন ছুটি বৈঠকখানীমাত্র, এবং নূতনটি অন্তঃপুর। বহুমূল্য ইংরাজি উপকরণের দ্বারা সকল অট্টালিকা সজ্জিতা, বিশেষতঃ, অন্তঃপুরমহলের সজ্জা কল্পনাতীত। যে সকল রাজবাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি, ইহার তুলনায় কিছুই নহে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, মহারাজ সস্ত্রীক শৈলবিহারে গিয়াছিলেন। সমুদায় গৃহ জনশূন্য। সহকারী মন্ত্রীর আদেশে, আমরা মহারাজার শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত নয়ন ভরিয়া দেখিলাম। দেখিবে কি, যে দিকে নয়ন ফিরাইবে, চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে। বোধ হইল, মহারাজা ইউরোপীয়ের মত থাকেন। স্নানাগার পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট মর্ম্মরের ইউরোপীয় উপকরণে সজ্জিত। নরচক্ষে যাহা দেখে নাই, তাহাও আমরা দেখিলাম। একটি কক্ষের প্রাচীরে এক বৃহৎ তৈলচিত্রে কি ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইনি মহারাজার মৃতা রাণী লক্ষ্মীবাই। এই চিত্রখানির প্রতি আমরা বহুক্ষণ নিমেষশূন্য চিত্রবৎ চাহিয়া ছিলাম। চিত্রখানি মানুষের বলিয়া ত বোধ হইল না। কি মুখ, কি চোক্, কি শরীরের দীর্ঘগঠন, কি চম্পককোরক-নিভ বর্ণ, কি অতুলনীয়া অঙ্গভঙ্গী, কিছুই যেন মানুষের বলিয়া বোধ হইল না। আমাদের বোধ হইল, যেন একটি রূপের স্বপ্ন দেখিতেছি। মহারাষ্ট্রীয় বেশে চিত্রময়ী ভূষিতা। সম্মুখের কুঞ্চিত কোঁচাগ্র, সম্মুখ হইতে বঙ্কিমভাবে পদ মধ্য দিয়া অসাবধানে পশ্চাৎ দিকে পড়িয়া কি শোভায়ই

বিকাশ করিতেছে! জয়পুরের আয় ৬০ লক্ষ, যোধপুরের ৪০লক্ষ, এবং বরদার ১॥ ক্রোর! যদি বিধাতা আমাকে বলিতেন, তুমি এ সুন্দরীকে চাহ, কি বরদার সিংহাসন চাহ, আমি অম্লান-বদনে এই পার্থিব রাজ্য না চাহিয়া, এই অপার্থিব রূপরাজ্য ভিক্ষা চাহিতাম। ভৃত্যেরা বলিল, চিত্রে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই। তাহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। আবার যেমন রূপ, তেমনই মন, তেমনই হৃদয়। ভৃত্যগণ এখনো তাঁহার জন্যে হাহাকার করিতেছে। তিনি একটিমাত্র পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। শিশুটিরও তৈলচিত্র অন্য কক্ষে দেখিলাম। যদিও মার সম্পূর্ণ রূপ পায় নাই, তথাপি মরি! মরি! কি রূপ! শিশু ত নহে, যেন একটি স্বর্গীয় কুসুমকোরক! কক্ষান্তরে মহারাজার বর্ত্তমান মহিষীর একখানি অসম্পূর্ণ তৈলচিত্র দেখিলাম। তিনিও কিছু কুৎসিতা নহেন। তথাপি, এই মোহিনীর ছায়াতে তাঁহাকে কি কুৎসিতই দেখাইল। ভৃত্যেরাও আমাদের মতের প্রতিপোষণ করিল। এই রমণীরত্নের দৃষ্টিতলে, এবং তাঁহার শিশুপুত্রের মুখখানি দেখিয়া, মহারাজা যে কি প্রকারে দ্বিতীয় রমণীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, আমি ত বুঝিতে পারি না। কর্ম্মচারীরা বলিলেন, রাজকার্য্যে অধিক পরিশ্রম নিবন্ধন গাইকোয়ারের শিরোরোগ হইয়াছে। তাই তিনি বারম্বার ইউ-রোপে ও শৈলে শৈলে এমন করিয়া বেড়াইতেছেন। মধ্যে সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে, তিনি উন্মত্ত হইয়াছেন। আমার মতে, কার্য্যাধিক্য ইহার কারণ নয়, এই স্ত্রীবিয়োগই ইহার কারণ।

কিন্তু এ হেন ইন্দ্রপুরীতেও মহারাজার সাধ মিটিল না।

আর একটি কি অপূর্ব্ব রাজবাটীই প্রস্তুত হইতেছে! ইহাতে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ হইতে আরও ২৫ লক্ষ লাগিবে। যে ইহার কল্পনা করিয়াছিল, সে এক জন অদ্ভুত কবি। ময়দানব তাহার শিষ্য হইবার যোগ্য নহে। আমি ইহার কি বর্ণনা করিব? প্রথম একটি প্রকাণ্ড ত্রিতল উচ্চ হল। তাহার পর প্রাঙ্গণ বেষ্টিয়া গাইকোয়ারের বহির্মহল, তাহার পর অন্তঃপুরমহল। এই উভয় মহল, 'হলের' সমান উচ্চ, ত্রিতল। মহলে মহলে প্রাঙ্গণ বেষ্টিয়া অসংখ্য কক্ষ। এক একটি কক্ষ, এক একটি গৃহ বলিলেও চলে,—এত প্রশস্ত। চিতোরের 'কীর্ত্তি-স্তম্ভে'র মত একটি স্তম্ভ, ত্রিতল ভেদ করিয়া গগনমার্গে উঠিয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে! স্তম্ভটি দশ কি দ্বাদশ তল। তবে, চিতোরের তলায় তলায় মধ্য কক্ষে এক একটি দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। এখানে স্তম্ভারোহী রমণীদিগের বসিবার জন্যে তাহা শূন্য রাখা হইয়াছে। বোধ করি, উপযোগী উপকরণে সজ্জিত হইবে। এই বৃহৎ অট্টালিকার সমস্ত কক্ষগুলি—এমন কি প্রবেশপথ পর্য্যন্ত—স্বর্ণমিশ্রিত বর্ণে বিচিত্র কৌশলে চিত্রিত হইতেছে। বিলাত হইতে শিল্পকর আসিয়া, ইহার চতুর্দ্দিকে উদ্যান সৃষ্টি করিবে, এবং উপযোগী সজ্জা ও উপকরণ প্রস্তুত করিবে। কাণ্ডখানা কি বুঝিতে পারিলে কি? এই রাজবাটীর নাম "লক্ষ্মীমহল"। কিন্তু যে লক্ষ্মীর জন্যে এই অতুলনীয় পার্থিব স্বর্গ সৃষ্ট হইতেছিল, তিনি আজ কোথায়? প্রজারাও, তাঁহার স্মরণার্থ, নগরমধ্যে একটি 'ঘটিকাস্তম্ভ' প্রস্তুত করিয়াছে। আজ সেই লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে।

বোম্বাই।

বরদায় এক দিন মাত্র থাকিয়া আমরা বোম্বাই যাই। বোম্বাই নাম সম্বন্ধে দুটি প্রবাদ আছে। ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে যখন পর্ত্তুগিসেরা এ স্থানটি অধিকার করে, তখন ইহার 'বুয়ন বাহিয়া'—উৎকৃষ্ট বন্দর—নাম রাখে। তাহা হইতে বোম্বাই হয়। দ্বিতীয় প্রবাদ—'মম্বাই' বলিয়া এক দেবী ছিলেন। তাঁহার নাম হইতে ইংরাজেরা বোম্বাই বা বম্বে করিয়াছেন। এখনও বোম্বাই সহরের একটি অংশের নাম মম্বাই দেবী আছে। আর একটি অংশের নাম কামদেবী। বোম্বাইর অংশবিশেষ প্রকৃতই কামদেবীর স্থান। সে কথা পরে লিখিব।

বোম্বাই আমার কাছে শ্যামা ভারতমাতার জিহ্বা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। জননীর পশ্চিম তীর ব্যাপিয়া, উত্তর দক্ষিণ ঘাট গিরিমালা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরবৎ শোভা পাইতেছে। এই গিরিশ্রেণীই আমাদের কবিকল্পনার সম্বল 'মলয়াচল'। এই শৈলসমাচ্ছন্ন তীর হইতে জিহ্বার মত একটি ভূমিখণ্ড সমুদ্রবক্ষে ভাসমান। শ্যামার জিহ্বা রক্তবর্ণা। শ্যামা ভারতমাতার জিহ্বা শ্যামপত্র-সমাচ্ছন্ন সৌধ ও শৈলমালায় উদ্যানবৎ শোভিত। শ্যামার জিহ্বার চারিদিকে রক্ত-ফোঁটা চিত্রিত হইয়া থাকে। এ শ্যামা জিহ্বার চারিদিকে ফোঁটার মত ক্ষুদ্র শৈল-দ্বীপরাশি নীল সমুদ্রগর্ভে শোভা পাইতেছে। এখন বুঝিলে, বোম্বাই কি মনোহর উপদ্বীপ? ইহার তিন দিকে সমুদ্র পরিখার মত বেষ্টন

করিয়া রহিয়াছে। এ সমুদ্রে তরঙ্গ নাই, লহরী নাই, গর্জ্জন নাই। শান্ত, স্থির, নীরব। যেন একখানি অনন্ত নীল আরসি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে মধ্যে এক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ যেন এক একটি সুন্দর ফুলের মত শোভা পাইতেছে। বোম্বাইর উভয় পার্শ্বে নানা স্থানে সমুদ্র শাখা ভূমিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এ সকল শাখার উপর দিয়া রেলওয়ের দীর্ঘ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। গাঁড়ী এই সলিলরাশির উপর দিয়া, উভয় পার্শ্বে সুপারি, তাল, নারিকেল, খর্জ্জুর বৃক্ষশোভিত গিরিমালার মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে, কি চঞ্চল চিত্ত-বিনোদন প্রাকৃতিক শোভাই প্রাণ মন মোহিত করিয়া দেয়।

আমরা প্রথমেই জিহ্বার অগ্রভাগস্থ পর্ব্বতস্থিত ইংরাজদিগের বসতিস্থান দেখিতে যাই। এই পর্ব্বতটির নাম "মেলেবার হিল," তাহার প্রান্ত সীমাগ্রে শৈবালসমাবৃত হংসের ন্যায়, বোম্বাইয়ের গবর্ণরের রাজপ্রাসাদ সমুদ্রে ভাসিতেছে। এই পর্ব্বতটি ইংরাজদিগের গৃহাবলীতে সমাচ্ছন্ন। উভয় পার্শ্বের সমুদ্র সকল গৃহ হইতে দেখা যায়; পর্ব্বতটির সর্ব্বত্রে পথমালা এরূপ বিচিত্র কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, সকল দিকে গাড়ী চলিয়া যায়। রক্তবর্ণ রাজপথসমূহ গিরি-অঙ্গে যেন প্রবালহারাবলীর মত শোভা পাইতেছে। উভয় পার্শ্বে মনোহর সৌধ ও উদ্যানমালা, এবং তাহার বিরাম-স্থান-পথে সমুদ্রের নীল কান্তি দর্শন করিয়া শকটভ্রমণ কি মনোহর!

ফিরিবার সময়ে এই পর্ব্বতস্থিত পার্সিদিগের "নীরব মন্দির" বা সমাধিস্থান দর্শন করি। মূল সমাধিস্থানটি একটি গোলাকার প্রাচীর মাত্র। তাহার অন্তর্বর্ত্তী স্থানটি চক্রাকারে তিন মণ্ডলে

বিভক্ত করা হইয়াছে। কেন্দ্রস্থলে একটি কূপ; তাহাকে বেষ্টিয়া যে মণ্ডল, তাহাতে শিশুদিগের, তাহার বাহিরের মণ্ডলে রমণী-দিগের, তাহার বাহিরের মণ্ডলে পুরুষদিগের শব রক্ষিত হয়। প্রাচীরের এক স্থানে একটি গবাক্ষ আছে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা এই গবাক্ষ পর্য্যন্ত শব লইয়া গেলে, সমাধিস্থ দুই জন ভৃত্য এখান হইতে শব ভিতরে লইয়া যায়। তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার পর শবটির বসন মোচন করিয়া, উপযুক্ত মণ্ডলে রাখিয়া দেয়। অল্পকাল মধ্যেই শকুনে তাহা নিঃশেষ করিলে, ভৃত্যেরা অস্থি সকল মধ্য কূপের গর্ভে ফেলিয়া দেয়। কালে উহা চূর্ণে পরিণত হইয়া, কূপতলস্থ জলপ্রণালী দিয়া পর্ব্বতের উপত্যকায় গিয়া, ভূমির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। মানুষকে এরূপ শকুনের আহার্য্য করা আপাততঃ শুনিতে বড়ই নিষ্ঠুরতা বলিয়া বোধ হয়। তবে চক্ষের উপর পোড়াইয়া ফেলা, কিম্বা ভূমিগর্ভে অসংখ্য কীটের আহার করিয়া দেওয়াও কি নিষ্ঠুরতা নহে? যখন আর্য্যজাতিরা কেবল বৈদিক অগ্নির উপাসক মাত্র ছিলেন, তখন দুই ভাগ হইয়া উত্তর কুরু হইতে এক শাখা ভারতে প্রবেশ করেন, অন্য শাখা পারস্য দেশে গমন করেন, ইহারাই পার্সি। ভারতীয় আর্য্যদিগের ধর্ম্মের অনন্ত রূপান্তর ও উন্নতি হইয়াছে। পার্সিয়া এখনও অগ্নি-উপাসক। উত্তর কুরু শীতপ্রধান দেশ, অতএব অগ্নি তথায় মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন, প্রধান দেবতা। শব দাহ করিতে অগ্নির ও ইন্ধনের অপব্যয়, বৃক্ষ-বিরল শীতপ্রধান দেশে সম্ভব নহে। সেই জন্যে উত্তর কুরুতে শব এরূপে পশু পক্ষীর আহারের জন্যে ফেলিয়া রাখা হইত,

ইউরোপে এখনও ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয়া থাকে। পার্সিরা সেই পূর্ব্ব নিয়ম রক্ষিত করিয়া আছেন। ভারতে কাষ্ঠের অভাব নহে, কাযেই এই নিষ্ঠুর নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এরূপে দেশ, কাল ও অবস্থাই মানুষের জাতীয় আচার ব্যবহারের রূপান্তরের মূলীভূত কারণ।

তদ্ভিন্ন আর একটি গভীর তত্ত্ব পার্সি ও হিন্দুদিগের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ভিতরে নিহিত আছে। উভয় জাতির ধর্ম্মনীতির মূল—সর্ব্বভূতহিত। শবটি পোড়াইয়া ফেলিলে কি কবর দিলে, আপাততঃ কাহারও হিতসাধন করা হয় না। কালে তাহা ভূমি, জল, ইত্যাদি পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া, শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া, জীবহিত সাধন করে সত্য, তবে সে বহুকালসাপেক্ষ এবং তত্ত্বটি জটিল। পার্সিদিগের শব তৎক্ষণাৎ পশু পক্ষীর আহার হইয়া প্রত্যক্ষ জীবহিত সাধন করে, এবং অস্থিও কালে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। আমি ত মরিয়া গিয়াছি, সুখ দুঃখের অতীত হইয়াছি; অতএব, আমার লোষ্ট্রবৎ জীবনশূন্য দেহটি আহার করিয়া যদি কয়টি প্রাণীর তৃপ্তি হয়, ক্ষতি কি? দেহটি ধ্বংস করা ও ভূগর্ভে পচিতে দেওয়া অপেক্ষা, এরূপ জীবহিতে নিয়োজিত হওয়া কি ভাল নহে?

পর দিবস নগর দর্শন করিতে করিতে আমরা খ্যাতনামা 'হস্তিগুম্ফা' দেখিতে যাই। বোম্বাই নগরটি দেখিতে অতি সুন্দর। কলিকাতার মত এমত বৃহৎ অট্টালিকা নাই, তবে অট্টালিকাগুলি বহুতলবিশিষ্ট এবং বড় কবিত্বপূর্ণ। প্রত্যেক গৃহ নানারূপ বারাণ্ডা ও নানারূপ কোণবিশিষ্ট। আকৃতিবৈচিত্র্য বড় মনোহর। বোম্বাই নগরের দুইটি বিশেষ লক্ষণ। অধিকাংশ

অট্টালিকার সর্ব্বোচ্চ তলার ছাদ খোলার, এবং ফুল অতি বিরল। সমুদ্রের লবণাক্ত বাতাসে ফুল বাঁচে না, বোধ হয়। সমুদ্রানিল সলিলসিক্ত বলিয়া বোম্বাই অঞ্চলে গ্রীষ্মের প্রখরতা নাই, এবং লবণাক্ত বলিয়া শীতেরও প্রবলতা নাই। এই পৌষ মাসের মধ্যভাগেও আমরা কিছুমাত্র শীত অনুভব করিলাম না। এ জন্যেই কবিরা মলয়াচলকে চিরবসন্তের আলয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং এই জন্যেই মলয়ানিলের এত গুণগান। তবে এ বসন্ত পুষ্পহীন বোধ হইল, এবং এ মলয়াচলে চন্দনবৃক্ষ ও ভুজঙ্গ নাই বলিয়া তারাচরণের দৃঢ় বিশ্বাস,—মলয়াচল ব্রহ্মদেশে। জানি না, সেই চিরবসন্তের দেশে থাকিয়া তোমার ভায়া কি দারুণ বিরহযন্ত্রণাই ভোগ করিতেছেন!

আমরা একখানি 'জালিবোট' ভাড়া করিয়া, সমুদ্রগর্ভস্থ এলিফেণ্টা বা হস্তিগুম্ফা-দ্বীপ দেখিতে গেলাম। এই সমুদ্রবিহার আমি এ জীবনে ভুলিব না। স্থানে স্থানে খণ্ড-পর্ব্বত সমুদ্রগর্ভে যেন এক একটি দোল কিম্বা এক একখানি রথের মত ভাসিতেছে। তাহার মধ্য দিয়া আমাদের তরণী ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। কোনো খণ্ড-শৈলে ইংরাজরাজ বোম্বাই রক্ষণার্থ অস্ত্রাগার, কোথাও বা বারুদাগার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শ্বেত অট্টালিকাটি দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন একটি রাজহংস গিরিশিরে বসিয়া সমুদ্র শোভা দেখিতেছে। স্থানে স্থানে যুদ্ধযান এবং বৃহৎ বৃহৎ বাষ্পীয় যান সকল সগর্ব্বে ভাসিতেছে। আমাদের ক্ষুদ্র তরণী হংসিনীর মত তাহার পার্শ্বে ক্রীড়া করিতে করিতে চলিয়াছে। বহু দূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম—অহো! কি দৃশ্য!

বোম্বাই।

"দূরে চক্রনিভ তন্বী, তমাল তালের লীলা,
কলঙ্ক রেখার মত শোভে লবণাম্বু বেলা।"

তমাল দেখি নাই। কিন্তু তালজাতীয়-বৃক্ষশীর্ষ-বন-রাজি-মণ্ডিতা, সৌধমালায় বিচিত্রিতা বোম্বাই নগরী কি শোভার ভাণ্ডারই লবণাম্বুতীরে খুলিয়া রাখিয়াছে, এবং কি মনোহর নীলদর্পণে কি মনোহর মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব দেখিতেছে! যে ব্যক্তি একবার সমুদ্রগর্ভ হইতে, এই 'মলয়াধারের তীর সুবঙ্কিম' এবং এই মধ্যাহ্ন রবিকরে "মলয়াচলের-উজ্জ্বল-নীলিমা" নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছে, সে কখনও উহা ভুলিতে পারিবে না।

এলিফেণ্টা দ্বীপের পর্ব্বতটি বৃক্ষাবলীতে বড় সুন্দররূপে শোভা পাইতেছিল। এই পর্ব্বতের কটিদেশে 'হস্তিগুম্ফা,' তাহা হইতে ইহার নাম 'এলিফেণ্টা' হইয়াছে। এই গুম্ফা-দ্বারে পুরাকালে একটি প্রস্তরের হস্তী ছিল। সমুদ্রতীর হইতে গুম্ফা পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী উঠিয়াছে। জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও তাঁহার শ্বেতাঙ্গিনী প্রিয়া এখন গুম্ফার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহাদের পাশ লইয়া গুম্ফা দর্শন করিতে হয়। দুইটিই বেশ ভদ্র লোক। যদিও বহুতর শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীরা তখন গুম্ফাদ্বারে বিরাজ করিতেছিলেন, কেহ পান করিতেছেন, কেহ ভক্ষণ করিতেছেন, কেহ সমুদ্র শোভার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বৃক্ষ-দোলায় দুলিতেছেন, তথাপি তাঁহারা আমাদের প্রতি খুব ভদ্রতা দেখাইলেন। পর্ব্বতের প্রস্তর বক্ষ কাটিয়া, 'রাজগিরের' শোনভাণ্ডার কক্ষের মত, কিন্তু তদপেক্ষা বড়, একটি কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে। কক্ষ, প্রাচীর বড় সুচারুরূপে নির্ম্মিত নহে। 'বরাবরের' গুম্ফা সকল এতদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, তাহাদের প্রাচীরে মুখ দেখা যায়,

এমনি মসৃণ! তবে কক্ষটির প্রাচীরের গায়ে বহুতর হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবী মূর্ত্তি স্থাপিতা রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি তত শিল্পনৈপুণ্য-পূর্ণ না হউক, নিতান্ত মন্দ নহে। তাহার পার্শ্বে অসম্পূর্ণ আরো ২।৩ টি ক্ষুদ্র গুম্ফা আছে। আমার বোধ হইল, এই গুম্ফা বৌদ্ধদের কর্ত্তৃক তপস্যার জন্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর, হিন্দুরা অধিকার করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ, দুই স্থানে দুইটি শিবলিঙ্গ বসান হইয়াছে, দেখিলে বেশ উপলব্ধি যে, সেখানে অন্য কোনও মূর্ত্তি ছিল, তাহা উঠাইয়া শিবলিঙ্গ স্থাপিত করা হইয়াছে। গর্ত্তটি লিঙ্গ অপেক্ষা বড়। এই পর্ব্বত হইতে চতুর্দ্দিকস্থ সমুদ্রগর্ভে ভাসমান পার্ব্বত্য দ্বীপপুঞ্জ ও সমুদ্র-শোভা দেখিলে চোক ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। মুহূর্ত্ত এই শোভা দেখিয়া আমরা ফিরিলাম। প্রতিকূল বাতাস নিবন্ধন অর্দ্ধ পথ আসিলেই সন্ধ্যা হইল, জ্যোৎস্না উঠিল; পটপরিবর্ত্তন হইয়া জ্যোৎস্নাপ্রোদ্ভাসিত, পর্ব্বত-দ্বীপ-খচিত, সমুদ্রের কি মনোমুগ্ধকর শোভা হইল। মনের আনন্দে সকলে মিলিয়া গাহিতে গাহিতে বোম্বাই ফিরিয়া আসিলাম। গীত যেন আপনি হৃদয় উচ্ছ্বসিত করিয়া বহিতেছে, তরণী যেন সেই গীতের তালে তালে মনের আনন্দে নাচিতেছে। পূর্ব্ব দিন মলয়-পর্ব্বত-শিরে দাঁড়াইয়া, এই সমুদ্রের দিকে চাহিয়া, আমিও বাইরণের মত স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—

মলয় বোম্বাই বক্ষে;
বোম্বাই সমুদ্র তীরে;
তথা দাঁড়াইয়া একা দেখিনু স্বপন,—
ভারতের সুখসূর্য্য আসিবে রে ফিরে!

বাইরণের স্বপ্ন ফলিয়াছে;—গ্রীসের সুখের দিন ফিরিয়াছে। আমার স্বপ্ন ফলিবে কি?

পূনা

কাল প্রাতে বম্বে ছাড়িয়া অপরাহ্ণ ৫টার সময়ে পূনা পঁহুছি। বম্বে ২টা দিন কি কষ্টে কাটাইয়াছি বলিতে পারি না। তারাচরণের হিন্দুয়ানীর কল্যাণে যে এক মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু হোটেলে উঠিয়াছিলাম, তাহার বিচিত্র নাম পূর্ব্বে লিখিয়াছি। ইনি মহারাষ্ট্রীয় এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের দস্যুপ্রবৃত্তির একটি জীবন্ত মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিখানি দেখিয়াই আমার চমক লাগিয়াছিল। আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম যে, আমরা এক ব্যাধের ফাঁদে পড়িয়াছি। তিনি আমাদের অর্থ শোষণ করিবার জন্যে জাল পাতিতেছিলেন। আর একটি ভুক্ত-ভোগী বাঙ্গালী, তাঁহার হোটেলে ছিলেন, ইহাঁর কৃপায় আমরা রক্ষা পাই। যাহা হউক, অর্থ না হউক, দুই দিন যাবৎ আমাদের শোণিত শোষিয়া, ইনি ৭।৹ লইয়া আমাদিগকে ছাড়েন। লইলেন ৭।৹ আনা, খাইতে দিয়াছিলেন ছটাক দুই চাউল, আর খানিকটা মূলার শাক। তাঁহার বিচিত্র হোটেলে যদি আধ ঘণ্টা কালও থাক, তবে সমস্ত দিবসের ভাড়া দিতে হয়। কাযে কাঁযে আমাদিগকে কাল অনাহারে ছাড়িতে হয়, এবং সমস্ত দিন অনাহারে থাকিতে হয়। যাহা হউক, সেই "নারায়ণ-ভোজন-বস্তি-গৃহ" বা গ্রহ হইতে উদ্ধার

পাইয়া, আমি নারায়ণকে ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। হোটেল কর্ত্তার নাম নারায়ণ। তিনি আমাদিগকে ভোজন না করিয়া যে গ্রাসমুক্ত করিয়াছেন, তাহা দুইটি রমণীর এয়োতির জোর বলিতে হইবে।

'কল্যাণ' ষ্টেসন হইতে আমরা ঘাট পর্ব্বত বা মলয়াচল আরোহণ করিতে আরম্ভ করি। গরজাট ষ্টেসন হইতে দুই খানি এঞ্জিন ট্রেনের অগ্রে ও পশ্চাতে সংযোজিত হয়। কখন বা পশ্চাতের এঞ্জিনে টানিয়া আমাদিগকে দেখিতে দেখিতে পর্ব্বত-সানুদেশে, অর্থাৎ সমুদ্র-উপকূল হইতে ২০০০ ফিট উর্দ্ধে তুলিয়া ফেলে। এই গগণবিহার বিজ্ঞানের একটি চরম গৌরব। কখন বা উচ্চ সেতুর উপর দিয়া, কখন বা গিরিপার্শ্ব বাহিয়া, ট্রেন নক্ষত্র বেগে ছুটিতেছে। যদি এক পা এ-দিক ও-দিক হয়, তবে সহস্র সহস্র ফিট গভীর গিরিগহ্বরে পতিত হইবে। আর কখন বা গিরিগর্ভ ভেদ করিয়া, সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া, অন্ধকারে ছুটিয়া যাইতেছে। এরূপে ২৫টি সুড়ঙ্গ পার হইয়া আসি। গাড়ীতে আলো দেওয়া আছে, সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলে ঠিক যেন রাত্রি। এক একটি সুড়ঙ্গ এত দীর্ঘ যে, ট্রেন ২।৩ মিনিট তাহার ভিতর থাকিয়া যায়। রেলপথের দুইদিকের দৃশ্যই বা কত মনোহর। অনন্ত গিরি-শ্রেণী স্তবকের পর স্তবকে সজ্জিত রহিয়াছে। সুদূরে, কোনও শৃঙ্গে, পুরাতন মহারাষ্ট্র দুর্গের ভগ্নাবশেষ শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে নির্ঝর স্রোত নীল-মণি-হারের মত দেখাইতেছে।

সেই যে ২০০০ ফিট উপরে উঠিয়াছি, আর আমরা নামি নাই। উপরে উঠিলে রেল প্রায় সমসূত্রে পুনা পর্য্যন্ত চলিয়া আসি-

য়াছে। অতএব বুঝিতে পারিতেছ যে, পূনা নগর সমুদ্রতীর হইতে ২০০০ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। এই আকাশের উপর মহারাষ্ট্রের কি বিশাল রাজ্যই অবস্থিত ছিল।

এলাহাবাদের জনৈক ডাক্তার, পূনার জন্যে একখানি পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। আসিয়া দেখিলাম, যাঁহার নামে পত্র, তিনি এক জন ছাত্র। ইহঁারা কয়েক জন বাঙ্গালী ছাত্র এখানের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িতেছেন। তাঁহাদের ছাত্র-আবাসে বসিয়া তোমার কাছে পত্র লিখিতেছি। তাঁহারা আমাদের বড় যত্ন করিতেছেন। একটি ছাত্র ভিন্ন এখানে আর বাঙ্গালী নাই।

অদ্য প্রাতে প্রথমে পার্ব্বতীর পর্ব্বত আরোহণ করি। যাইবার পথে পর্ব্বতের পাদমূলে একটি ঝিল, তাহার মধ্যস্থানে একটি দ্বীপ। ঝিল এখন শুষ্ক, দ্বীপ এখন জঙ্গল। পর্ব্বতে উঠিয়া প্রথমেই পার্ব্বতীর মন্দিরে যাই। মধ্যস্থলে রজতনির্ম্মিত শিব। "রজতগিরিনিভং" ধ্যানবাক্যের প্রতিমূর্ত্তি। এক পার্শ্বে স্বর্ণ-পার্ব্বতী "তপ্তকাঞ্চনাভা," অন্য দিকে সোণার গণেশ। উভয়কে অঙ্কে লইয়া, মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মহারাষ্ট্র বেশ, মাথায় একটি প্রকাণ্ড পাগড়ি। আমার বোধ হইল—সিদ্ধি, শক্তি এবং নিষ্কামতা, যেন একাধারে এই ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। এই ত্রিমূর্ত্তির বা ত্রিশক্তির সাধনা দ্বারা শিবজী মহারাষ্ট্র রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মোগল রাজ্যের অধঃপতন ঘটাইয়াছিলেন। এই মহাসাধনা ভুলিয়া, তাঁহার কাপুরুষ উত্তরাধিকারী বাজিরাও, সেই সাম্রাজ্য হারাইলেন, ভারতকে ইংরাজ-কবলে কবলিত করিলেন। ত্রিমূর্ত্তিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, পার্শ্বস্থিত সৌধশিরে আরোহণ করিলাম। এই মন্দিরের

পার্শ্বে, শেষ মহারাষ্ট্রাধিপতি পেশোয়া বাজিরাওর অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অদূরে শৈলশেখরে শিবজীর খ্যাতনামা দুর্গত্রয়—সিংহগড়, রাজগড় এবং রায়গড়—আকাশের গায়ে চিত্রপট দেখাইতেছে; চারিদিকে গিরিশ্রেণী আকাশে তরঙ্গ খেলিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদের প্রত্যেকের অঙ্গে অঙ্গে মহারাষ্ট্রদিগের গৌরবের ও অধঃপতনের ইতিহাস লিখিত রহিয়াছে, একটি পর্ব্বতের কক্ষদেশে "চতুঃসিংহ" মন্দির একটি শ্বেত কুসুমের মত শোভা পাইতেছে। ইহাতেও হর-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে। দশমী দিবসে, মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাদের পূজা করিয়া, দেশলুণ্ঠনে এবং যুদ্ধে যাত্রা করিতেন। আমার কর্ণে যেন সেই বীরকণ্ঠ, সেই "বম বম বম হর হর" রব স্বপ্নশ্রুত শব্দের ন্যায় প্রবেশ করিতে লাগিল—

"হর হর হর বলে; কি কাণ্ড করিলে বলে;
সেই সিংহনাদ আজি হয়েছে স্বপন!
মহারাষ্ট্র ইতিহাস অদ্ভুত যেমন!"

শিব-শক্তির মন্দিরের পদমূলে, সেই কির্কির যুদ্ধক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে পেশোয়ার রাজমুকুট খসিয়া পড়ে। কাপুরুষ বাজি-রাও, প্রাণভয়ে পার্ব্বতীর মন্দিরের একটি কক্ষে বসিয়া, এই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তাহার অদৃষ্টের পরীক্ষা দেখিতেছিল। ইংরাজদিগের জয় হইলে, সেই কক্ষ হইতে পলায়ন করে, এবং ধৃত হইয়া বিঠুরে বন্দী হয়। নানা সাহেব তাহারই পোষ্যপুত্র। সেই হর-পার্ব্বতীর, সেই শিব-শক্তির মন্দির এখনও বিদ্যমান রহি-য়াছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রদিগের শিব (মঙ্গল) ও শক্তি (বীরতা) চিরদিনের জন্যে অস্তমিত হইয়াছে। আজ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে,

হর-পার্ব্বতীর মন্দিরের ছায়াতলে, বঙ্গের গবর্ণরের বাড়ী এবং সৈন্যগৃহাবলী শোভা পাইতেছে। ইহাদের এত দূর অধঃপতন ঘটিয়াছে যে, মন্দিরের পূজক শিবের ধ্যানটি পর্য্যন্ত বলিতে পারিল না, এবং পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, মৃত ভাষা সংস্কৃত তিনি কি জন্য শিখিবেন। তিনি ইংরাজিতে আমাদের কাছ হইতে কিছু উশুল করিবার জন্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন অর্থগৃধ্নু নরপিশাচ আমি যেন আর দেখি নাই। সে তাহাদের জাতীয় ইতিহাসের কিছুই জানে না। আমি তাহাকে সেই জন্যে ৵০ আনা পয়সা মাত্র দিয়া আপনার ইতিহাসখানি পড়িতে বলিলাম।

ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া, পার্শ্বস্থিত এক মন্দিরে কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্ম্মিত কার্ত্তিকের ও অন্য মন্দিরে নারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করি। দেবতারা সকলেই এখন ইংরাজ রাজ্যের বৃত্তি-ভোগী। বিষ্ণুর মন্দিরে অতি সুন্দর সঙ্গীত হইতেছিল। পূজক ব্রাহ্মণও একটি অতি সুন্দর ধ্যান বলিলন। আমি লিখিয়া লইয়াছি।

পার্ব্বতীর পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়া, পূনার ‘শিল্প-প্রদর্শনী’ দেখিতে যাই। প্রদর্শনী কাল বন্ধ হইয়াছে। কর্ম্ম-চারীগণ প্রথম বলিলেন, আমাদিগকে না দেখিতে দিবেন, না কোনও জিনিস কিনিতে দিবেন। দুই এক কথা বলিলে বলি-লেন, কি করিবেন, নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। নিতান্ত পক্ষে সম্পাদকের মত চাহি। তাহার পর দু’চার কথা তীব্র বিদ্রূপ শুনিয়াই নিয়মও লঙ্ঘন করিলেন, দেখিতেও দিলেন, কিনিতে দিতেও স্বীকৃত হইলেন। তাহার পর সহর দেখি।

দেখিলাম, পেশোয়াদের পুরাতন রাজবাটীর একটিতে বৃটিশদিগের পুলিস ষ্টেসন বিরাজ করিতেছে। তাহার পর দুর্গ দেখিতে গেলাম। দ্বারদেশে আমাদের জনৈক পুলিস প্রভু, বিরাজিত। বলা বাহুল্য যে আর দেখা হইল না। ভিতরে, দেখিবারও কিছু নাই। তাহার পর, বাজার দেখিয়া গৃহে আসিলাম। শিবজী, আপন গুরুকে দান করিয়া পুণ্য করিয়াছিলেন বলিয়া এ স্থানটির নাম—শুনিলাম—পূনা হইয়াছে। আজ সেই পূনা নগর, মহারাষ্ট্রীয়দের একটি ঐতিহাসিক মহাশ্মশান। পূনা 'সার্ব্বজনিক' সভাগৃহে, পেশোয়াদিগের জনৈক খ্যাতনামা মন্ত্রীর একখানি চিত্র দেখিলাম। এখন সেই বীর রাজা নাই, সেই গভীর রাজনৈতিক মন্ত্রীও নাই! মহারাষ্ট্রের ভাগ্যে, ভারতের ভাগ্যে, আবার সে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইবে কি না, কে বলিবে?

দণ্ডকারণ্য।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বোম্বাইয়ের "নারায়ণ-ভোজনবস্তি গৃহ" হইতে দুই দিনে উদ্ধার হইয়া পূনায় যাই। পূনার কথা লিখিয়াছি। পূনা হইতে 'নাসিক' যাই। পূনার মত নাসিকও মধ্যভারতের অধিত্যকায় ২০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। কল্যাণ ষ্টেসন হইতে ক্রমশঃ ১৩টি গিরিসুড়ঙ্গ ভেদ করিয়া, গাড়ী এই অধিত্যকায় আরোহণ করে। কিন্তু একবার উঠিলে অনন্ত সমতল ভূমি। তুমি এত উচ্চ স্থানে উঠিয়াছ বলিয়া বোধ হইবে না।

শুধু তাহা নহে, অধিত্যকাটি স্বর্ণপ্রসূ। চারিদিকে সুন্দর শস্য-ক্ষেত্র এবং নিবিড় আম্রবন দেখিলে, ঠিক যেন বঙ্গ দেশ বলিয়া বোধ হয়। ইহার জল বাতাস এত উৎকৃষ্ট যে, একবার নাসিককে ভারতের রাজধানী করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। লক্ষ্মণ এখানে সূর্পণখার নাসিকা কাটিয়াছিলেন বলিয়া, স্থানটির নাম "নাসিক" হইয়াছে, বোধ হয়। ষ্টেসন হইতে পাঁচ মাইল ব্যবধানে নাসিক নগর। টোঙ্গায় যাইতে হয়। এখানকার টোঙ্গাগুলি এক নূতন জিনিস। দেখিতে যেন কেনভাসের ছাদওয়ালা টম-টম। লাঙ্গলে যেরূপে গরু জুতিয়া থাকে, ইহাতে সেইরূপ দুটি ঘোড়া জুড়িয়া দেয়। কিন্তু নক্ষত্রবেগে চলিয়া যায়।

আমরা অপরাহ্নে নাসিকে গিয়া, পাণ্ডা অমৃতরাম অনন্তরাম সিঙ্গরিয়ার বাড়ীতে অতিথি হই, এবং তাহার ভ্রাতৃবধূ আম্বা দেবী আমাদের অন্নপূর্ণার কার্য্য করেন। পর দিবস প্রাতে, প্রথমে গোদাবরী দর্শন করি। গোদাবরীর গর্ভ প্রস্তরময়। তাহা কাটিয়া, দীর্ঘাকৃতি কুণ্ডরাশি সৃষ্টি করা হইয়াছে। কুণ্ডের দুই পার্শ্বে জলের রন্ধ্র রাখা হইয়াছে। তাহার দ্বারা কুণ্ড হইতে কুণ্ডান্তরে গোদাবরী স্রোত বহিয়া যাইতেছে। উপর দিয়া লোক এ পার হইতে ও পারে যাতায়াত করিতেছে। তারাচরণ গঙ্গাষ্টক আবৃত্তি করিতে করিতে, "তুঙ্গস্তনাস্ফালিত" জলে স্নান করিলেন। তাঁহার জন্যে ত এক ডুব দিলেনই। তাঁহার পিতা, মাতা, সর্ব্বশেষ আজন্ম পতিবিরহিনী পত্নীর জন্যেও এক ডুব দিলেন। আমার মাতা নাই, পিতা নাই। তাঁহারা উভয়ে বৈকুণ্ঠে; বহুদিন এই অযোগ্য পুত্রের পাপ পুণ্যের অতীত হইয়াছেন। আছেন পত্নী, কিন্তু তাঁহার স্বামী অবগাহন করিলে, সেই স্বামীর

পুণ্যের ভাগী তিনি হইতে পারিবেন কি না, আমার সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। সংসারসমুদ্রে ডুবিয়া ত তাঁহার জন্যে কোন পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি নাই। গোদাবরীতে ডুবিয়া কি পারিব? তদ্ভিন্ন, এ স্থানের জলের এরূপ বর্ণ যে, তাহা কেবল নিমজ্জিতা সুন্দরীদের "তুঙ্গ স্তন" মাত্র আস্ফালিত করিয়া আসিতেছে বলিয়া ত আমার বোধ হইল না। চক্ষের উপর দেখিলাম, কতরূপ ময়লাই এ স্থানে প্রক্ষালিত হইতেছে। এখানে স্নান করিতে আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না।

গোদাবরীর অপর পারেই 'দণ্ডকারণ্য।' এখন তাহা একটি ক্ষুদ্র গৃহারণ্য। গোদাবরী পার হইয়া আমরা প্রথম একটি বৃহৎপ্রাঙ্গণসম্বলিত মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্ত্তি দর্শন করি। প্রবাদ আছে যে, এখানে রামচন্দ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বনবাস করিয়াছিলেন। এই সেই রামায়ণের আরণ্যশোভাপূর্ণ পঞ্চবটী। প্রাঙ্গণে অনেকগুলি উদরসর্ব্বস্ব সন্ন্যাসী বসিয়া রহিয়াছে। এক জন আমাদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসিকতা করিলেন। তাহার পর আর একটি মন্দিরে যাই। এখানে কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। পাণ্ডা বলিলেন, এ মন্দিরে যাহা মানস করিব, তাহা পাইব। আমি বলিলাম, আমার কিছুই বাঞ্ছনীয় নাই। নারায়ণ আমাকে যাহা দিয়াছেন, আমি তাহাতেই সুখী। তারাচরণ বলিলেন, কিছু আমাকে প্রার্থনা করিতে হইবে। তখন আমি প্রার্থনা করিলাম—প্রভো! আমার নির্ম্মল তোমার কার্য্যের উপযোগী হউক। মনে মনে আর একটি প্রার্থনা করিলাম—তাহা বলিব না। তাহার কিঞ্চিৎ দূরে, ভূগর্ভে, একটি কক্ষে সীতা দেবীর একটি মূর্ত্তি স্থাপিতা আছে। আমি ইহার ভিতর কষ্টে প্রবেশ

করিয়াছিলাম, যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আইসে। তারাচরণের সাহস হইল না। মূর্খ পাণ্ডা বলিল, রামচন্দ্র রাবণের ভয়ে সীতাকে এইখানে লুকাইয়া রাখিতেন। তাহার রামায়ণের জ্ঞানও এই পর্য্যন্ত। সীতা এখানে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অবরুদ্ধা থাকিলে রাবণ সবংশে মরিত না, বাল্মীকিকেও এত শ্রম করিতে হইত না। তিনি এখানেই মরিতেন।

তাহার পর, প্রায় এক ক্রোশ দূরে তপোবন দেখিতে যাই। প্রবাদ, এখানে তপস্যা করিয়া লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিত-বধের শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এ স্থানটির মত এমন শান্তিপ্রদ স্থান আমি অল্প দেখিয়াছি। আমার বোধ হয়, এইটিই প্রকৃত বাল্মীকি-কল্পনার লীলাভূমি 'পঞ্চবটী'। এখনও পাঁচটি বট গাছ একস্থান আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। এখনও তাহার চারিদিকে নানাবিধ বনবৃক্ষ রহিয়াছে, এবং দেখিলে এককালে যে এই অধিত্যকাটি সম্যক অরণ্য ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অনতিদূরে আরাবলীর শেখরমালা এক পার্শ্বে আকাশের গায়ে চিত্রের মত দেখা যাইতেছে। অন্য দিকে রামায়ণের বর্ণনার সার্থকতা করিয়া, এখনও গোদাবরী নদী গদ্‌গদ্ রবে শিলা হইতে শিলান্তরে প্রবাহিতা হইতেছেন। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র জলপ্রপাত পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। এক পার্শ্বে নিবিড় অরণ্যময় তীরে নানাবিধ বনফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; অন্য পার্শ্বে তৃণশূন্য বন্ধুর পর্ব্বতশ্রেণী দৈত্য-ব্যূহের মত ভীমবেশে দাঁড়াইয়া আছে। এক স্থানে জল কিঞ্চিৎ গভীর। পাণ্ডা বলিলেন, লক্ষ্মণ এখানে সূর্পনখার নাক কান কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। আর এক বিদ্যাবাগীশ! তিনি এক ক্ষুদ্র গর্ত্ত সম্মুখে করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, রামচন্দ্র

রাবণের ভয়ে আসল সীতাকে এই কাঁকড়ার গর্ত্ত দিয়া পাতালে পাঠাইয়াছিলেন। রামায়ণের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া একটি পয়সা চাহিলেন। এখানে একটি জলপ্রপাতে আমি বড় প্রীতিভরে স্নান করিলাম। জননী শৈলসুতা, নীলমণিহারনিভ সুশীতল বারিধারা আমার মানব দেহে ঢালিয়া দিয়া মন প্রাণ পবিত্র করিলেন।

নর্ম্মদা।

এক দিন মাত্র নাসিকে থাকিয়া, ছাব্বিশ ঘণ্টা রেলে কাটাইয়া, আমরা অবসন্ন প্রাণে জব্বলপুর পঁহুছি। সেই রাত্রিতেই তারাচরণ চলিয়া আইসেন। পর দিন প্রাতে আমি নর্ম্মদা দর্শন করিতে যাই। জব্বলপুর হইতে এ স্থান এগার মাইল ব্যবধান; পথ অতি সুন্দর এবং ছায়াসমাচ্ছন্ন। প্রথমেই নর্ম্মদার জলপ্রপাত দেখিতে যাই। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 'ধূমধারা' বলে। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে, প্রস্তরগর্ভে বেগে জলধারা পড়িয়া যে জলকণা উৎকীর্ণ করে, তাহা দূর হইতে ঠিক ধূমের মত বোধ হয়। সেই জন্যে এই জলপ্রপাতের নাম ধূমধারা হইয়াছে। উভয় পার্শ্বে শ্বেত শৈলশ্রেণী। তাহাদের পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া, প্রস্তরগর্ভা নর্ম্মদা প্রবাহিতা। দেখিলেই মেঘদূতের সেই কবিত্বপূর্ণ চরণটি মনে পড়ে।

"রেবাং দ্রক্ষস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাম্।"

অর্থ,—

"বিষম উপল মাঝে—
বিন্ধ্যপদে শীর্ণা রেবা করিও দর্শন।"

নৰ্ম্মদার অন্য নাম রেবা, তাহা তুমি জান। অনুমান পঞ্চাশ হস্ত উৰ্দ্ধ হইতে, বহু ধারায় গর্জ্জন করিয়া, নৰ্ম্মদা ভীষণ বেগে পতিত হইয়া, এই অপূর্ব্ব জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছেন। নৰ্ম্মদা যেন অবিরাম সংখ্যাতীত শ্বেতকুন্দকুসুম রাশি বর্ষণ করিয়া বিন্ধ্য-পাদ পূজা করিতেছেন। জল তুষারবৎ শীতল। তথাপি এই প্রাকৃতিক কবিত্বস্রোতে অবগাহন না করিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। প্রপাতের নীচে নামিবার সাধ্য নাই। উপরিভাগে বসিয়াও স্নান করিবার সময় আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। স্রোতের বেগ এত প্রখর, কিন্তু চারি অঙ্গুলের অধিক জলের গভীরতা নাই।

ফিরিবার সময়ে, গৌরী-শঙ্কর দর্শন করি। জলপ্রপাত হইতে এই মন্দির পর্য্যন্ত, গিরিমূল অসংখ্য আমলকী, বেল ও নানাবিধ বনজাত ফলবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। দেখিলে, ঋষিদিগের পুরাতন আশ্রমের চিত্র মনে পড়ে। আমি কোনও কোনও ফল খাইয়া দেখিলাম। মন্দিরটি একটি শৃঙ্গে অবস্থিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—কেশবচন্দ্রের নববিধান! মধ্যস্থলে বৃষারূঢ়া হরপাৰ্ব্বতী। তাহার উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে গণপতির সঙ্গে বুদ্ধদেব নীরবে শোভা পাইতেছেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণের চারি দিকে, প্রাচীরের মত শ্রেণীবদ্ধ কক্ষমালা। প্রত্যেক কক্ষে এক একটি মূর্ত্তি বিরাজিত। অল্প বেশী সকলেরই ভগ্নাবস্থা।

পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন, চৌষট্টি যোগিনী। কিন্তু আমি তাহাতে যোগিনীর গন্ধও দেখিলাম না। আমি দেখিলাম, অধিকাংশই মাহেশ্বরী প্রভৃতি রক্তবীজবধের মহাবিদ্যা দুরবস্থাপন্না হইয়া পড়িয়া আছেন। মন্দিরটি এক সময়ে গৌরবাপন্ন ছিল, সন্দেহ নাই। এ পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে নর্ম্মদার উভয়তীরস্থ শৈলমালা ও উপত্যকার শোভা মনোমুগ্ধকর।

পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া আমি ভারতখ্যাত 'মার্ব্বলরক' বা মর্ম্মর পর্ব্বত দেখিতে যাই। এখানে নর্ম্মদার উভয়তীরস্থ পর্ব্বতই মর্ম্মর, কিন্তু উপরিভাগ তৃণ-গুল্ম-সমাচ্ছন্ন এবং বৃষ্টির দ্বারা বিবর্ণ হইয়াছে। সেরূপ অমল শ্বেতবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। জলপ্রপাত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে জলপতন-বেগে গর্ভস্থ প্রস্তর কাটিয়া একটি দীর্ঘাকার বিচিত্র সরোবর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে স্বয়ং প্রকৃতিই শিল্পী, সেখানে তাহার বিচিত্রতা এবং শোভার কথা কি বলিব? গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এখানে দুটি বাঙ্গালা এবং দুখানি প্লেজার বোট বা আমোদতরণী রক্ষিত হইয়াছে। তীরস্থিত গৃহ দুইখানি যেন দুখানি ছবি। ডিষ্ট্রীক্ট বাঙ্গালাটি এত সুন্দর, এবং স্থানটি এত হৃদয়মুগ্ধকর যে, আমার ইচ্ছা হইল, এখানে তোমাকে লইয়া যদি কিছুদিন থাকিতে পারি! আমি একখানি জালিবোটে নর্ম্মদার গর্ভে বেড়াইতে লাগিলাম। আমি ইহার কি বর্ণনা করিব? অমল ধবল হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এবং উভয় বর্ণের সংমিশ্রিত নানাবর্ণের, মর্ম্মরশৈলশ্রেণী উভয় পার্শ্বে সরল ভাবে মধ্যাহ্ন রবিকরে কি মহিমাপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পদতলে ঘুরিয়া ফিরিয়া নীল তরল অমৃতখণ্ডের মত

নৰ্ম্মদার গর্ভস্থ সরসী শোভা পাইতেছে। তাহার উভয় পার্শ্বে নানাবর্ণের মর্ম্মর প্রাচীরের ছায়া সেই নীলদর্পণে প্রতিভাত হইয়া, নানাবর্ণের মেঘমালায় খচিত এক খণ্ড আকাশের মত শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে মর্ম্মর গর্ভে কি সুন্দর সুন্দর কক্ষই নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে। কক্ষপ্রাচীর শ্বেত মর্ম্মরের; কক্ষতল নর্ম্মদা সলিলে নীল-মণিময়। স্থানে স্থানে মর্ম্মরখণ্ড নর্ম্মদার স্রোত অবরোধ করিতে চাহিতেছে, যেন গিরি হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছে। আবার স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড বিচ্ছিন্ন মর্ম্মর নদীগর্ভে ভাসমান। ঠিক যেন প্রকৃতি বিচিত্র বেদী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই সলিলখণ্ডে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়াছিলাম। আমার বোধ হইল, আমি যেন একটি অপ্সরাপুরীর স্বপ্ন দেখিতেছি। সেখানে সকলই যেন সুন্দর, কোমল, তরল। সেখানে সকলই প্রেম, সহৃদয়তা এবং মহাপ্রাণতা। আমার মনে হইল, এই সলিলখণ্ড বিন্ধ্যাচলের হৃদয়। বিন্ধ্যসুতা নর্ম্মদা দুহিতা-প্রেমামৃতে ইহা পূর্ণ করিয়া, কুলু কুলু রবে কাঁদিতে কাঁদিতে পতিগৃহে চলিয়াছেন। অদূরে জলপ্রপাতের শব্দ এখান হইতে শুনিতে কি মধুর, কি করুণ! অথবা যেন কোন সতী সাধ্বী আকুল হৃদয়ে পতিহৃদয়ে হৃদয় ঢালিতে চলিয়াছেন। সতী যে পথে যাইতেছেন, তাহার উভয় পার্শ্বস্থ সংসার-প্রস্তর-রাশিও যেন নির্ম্মল, পবিত্র ও সুশীতল করিয়া যাইতেছেন। বোম্বাই নগরের পার্শ্বস্থ আরব সমুদ্রে নৌকাবিহার, সে এক দৃশ্য—তাহা মহিমাপূর্ণ, অনন্ত প্রেমের আভাসপূর্ণ। নর্ম্মদায় নৌকাবিহার, সে অন্য দৃশ্য—তাহা মাধুর্য্যময়, ক্ষুদ্র বালিকার পিতৃপ্রেমের ক্ষুদ্র অথচ

গভীর উচ্ছ্বাস। একটি বীর পতির বিরাট হৃদয়, অন্যটি বালিকা নবোঢ়া বধূর ক্ষুদ্র বুক!

প্রাণ ভরিয়া নর্ম্মদার এই মোহিনী শোভা সন্দর্শন করিয়া, আসিবার সময়ে, পথে দুর্গাবতীর রাজধানী 'গড়া' এবং শৈল-শেখরস্থিত তাঁহার আবাসস্থান 'মদনমহল' দেখিয়া আসি। দুর্গাবতীর নাম তুমি 'পলাশিতে'ও পড়িয়াছ।

"তথাপি সমরে যেন রাণী দুর্গাবতী।"

ইনি পরম রূপসী গোণ্ডজাতীয়া বীরাঙ্গনা ছিলেন। স্বয়ং মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। স্বয়ং অশ্বারোহিণী হইয়া সম্মুখ সমরে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া ভারতবর্ষ তাঁহার কীর্ত্তিতে পূর্ণিত করিয়াছিলেন। এই দানবদলনীর দুর্গটির একটি মাত্র অট্টালিকা এখনও বর্ত্তমান আছে। উচ্চ শৈলশৃঙ্গের উপরে এক খানি প্রকাণ্ড গোলাকৃতি পাথর। তাহার পার্শ্ব হইতে সরল ভাবে প্রাচীর তুলিয়া একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পাথরের এক পার্শ্বেও একটি কক্ষ আছে। ইহা শুদ্ধ ধরিলে গৃহটি ত্রিতল। এই গৃহের দ্বিতীয়তল হইতে 'গড়া' নগরের দৃশ্য চিত্রিতবৎ সুন্দর দেখায়। পর্ব্বতটির চতুষ্পার্শ্বে স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক গড় বা ঝিল স্ফটিকখণ্ডের মত শোভা পাইতেছে। এই সকল গড় হইতে স্থানটির নাম গড়া হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গৃহটি পর্য্যন্ত এতদিন কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু সেই নিরুপমা সুন্দরী, সেই দিল্লীশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী বীরনারী আজ কোথায়! বিংশতি কোটী নরাধমে আজ ভারতমাতার বক্ষ গুরুভারে পীড়িত না করিয়া, যদি এরূপ একটি বীরনারী, একটি দুর্গাবতী থাকিত, জননীর কি দুর্গোৎসবই হইত! হায়! হায়!

দুর্গাবতীর কি চিরদিনের জন্যে বিজয়া হইল! আবার কি তাহার বোধন হইবে না?

জব্বলপুরে ফিরিয়া শিল্পবিদ্যালয় দেখিতে যাই। যে সকল 'ঠগেরা' ইংরাজ সাম্রাজ্যের আরম্ভে, গামছা মোড়া দিয়া সহস্র সহস্র পথিকের প্রাণহত্যা করিয়া ডাকাতি করিত, বৃটিশ শাসনের প্রভাবে, আজ তাহারা ও তাহাদের সন্তানেরা, এই জব্বলপুরে আবদ্ধ থাকিয়া, অপূর্ব্ব শিল্প কার্য্য সকল করিতেছে। এই বিদ্যালয় হইতে আমাদের তাঁবু শতরঞ্চি ইত্যাদি যাইয়া থাকি। যে হস্ত ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণসংহারক গামছা মুড়িত, আজ তাহা তাঁত বুনিতেছে। ইহা অপেক্ষা ইংরাজ রাজ্যের অধিক গৌরবের কথা কি হইতে পারে? ইহার যতই দোষ থাকুক না কেন, আজ ভারতবক্ষে যে সার্দ্ধ শতবৎসরব্যাপী অভিন্ন শান্তি আসমুদ্রগিরি বিরাজ করিতেছে, ভারতমাতা ইহা কথনও উপভোগ করেন নাই। ইংরাজ-সাম্রাজ্যের এই শান্তি অক্ষয় হউক!

সেই রাত্রিতেই এলাহাবাদ রওনা হই। পরদিন প্রাতে এখানে পঁহুছিয়া, ঈশ্বরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলাম। আমার ভারতভ্রমণবৃত্তান্ত শেষ হইল। কাল প্রাতে কলিকাতা যাই-তেছি। যদি সময় পাই, তোমার স্বজাতীয়াদের সম্বন্ধে একখানি পত্র কলিকাতা হইতে লিখিব। স্থানবর্ণনায় সে সকল কথা কিছু লিখিবার অবসর পাই নাই।

ভারত-রমণীর চিত্র।

তুলনায় সমালোচনা

তোমাকে আমার উত্তর-ভারত-ভ্রমণ সম্বন্ধে আর একখানি পত্র লিখিব বলিয়াছিলাম। তুমি তোমার স্বজাতীয়াদের সম্বন্ধে ২।১ কথা অবশ্য শুনিতে চাহিবে। এলাহাবাদ পর্য্যন্ত কুম্ভোদরীদের তুমি দেখিয়াছ, তাঁহাদের বেশ-ভূষার কথা অবগত আছ। দিল্লী পর্য্যন্তও প্রায় সেইরূপ। তবে সে অঞ্চলের রূপসীরা কাপড় একেবারে নাভির নীচে নগ্নতার শেষ সীমায় পরেন না। কিঞ্চিৎ উপরে কিঞ্চিৎ কসিয়া পরেন। উদরটি তত তানপুরার অধোভাগের মত দেখায় না। তাহার পর পঞ্জাব। পঞ্জাবিনীরা বেশ সুন্দরী। প্রকৃত আর্য্য আকৃতি ইহাদেরই আছে। রং যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। নাসিকা প্রকৃতই গৃধিনী-গঞ্জিত। তবে মুখের রেখাবলী আমাদের চক্ষে কিছু অধিক তীক্ষ্ণ বোধ হয়। তাহাদের পোষাক—পায়জামা, পিরাণ এবং চাদর। পায়জামা হাঁটু হইতে পা পর্য্যন্ত পায়ের সঙ্গে আঁটা। হাঁটুর উপর ঢিলা। পিরাণটি প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত পড়ে। শুনিলাম, সুন্দরীরা শয়ন করিবার সময় পায়জামা একেবারে খুলিয়া

ফেলিয়া কেবল পিরাণটি মাত্র অঙ্গে ধারণ করেন। পিরাণটি ইংলণ্ডীয় ললনাদের নাইট্ সার্টের কার্য্য করে।

বঙ্গ সুন্দরীদের মত ইহাদের পর্দ্দা আছে, তবে অপেক্ষাকৃত ইহারা স্বাধীন এবং সে স্বাধীনতায় কিঞ্চিৎ বীরত্ব আছে। একটি গল্প বলিব। হরিদ্বার হইতে গাড়ী আসিয়া লুস্কর ষ্টেষণে পঁহুছিল। এখানে অন্য গাড়ীতে যাইতে হয়, এবং তাহা আসিতে প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্ব হয়। আমি গাড়ীর পার্শ্বে প্ল্যাট্ফরমে বেড়াইতেছি। এক জন মধ্যবয়স্কা পঞ্জাববাসিনী আমাকে আহ্বান করিলেন। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, তাঁহার পার্শ্বে জ্বলন্ত অগ্নিশিখানিভ একটি পূর্ণকিশোরী কন্যা। মুখখানি কি লাবণ্যফুটনোন্মুখ কমলকোরকের শোভার ন্যায় নয়ন মোহিত করিতেছে। অর্দ্ধবয়সী আমার সঙ্গে অসঙ্কুচিত ভাবে আলাপ করিলেন। * * * এই নবীন পরিচিতার সঙ্গে বহুক্ষণ বেশ কৌতুকে কাটাইলাম। তাহার পর অন্য গাড়ী আসিয়া পঁহুছিল। আমার গাড়ীতে জিনিষ তুলিয়া আমি দ্বারের কাছে প্ল্যাট্ফরমে দাঁড়াইয়া আছি; পিঠে কি কোমল হাত লাগিল। ফিরিয়া দেখিলাম, মাতা ও কন্যা। যুবতী বলিলেন,—সাহেব! আমাকে আমার গাড়ীতে তুলিয়া দেও"। আমি আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম। তখন হুকুম হইল,—"আমার বৃদ্ধ পিতাকেও তুলিয়া দিয়া আইস।" আমি বলিলাম, "আমি তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে কি প্রকারে চিনিব?" এমন সময়ে বৃদ্ধ আসিয়া স্ত্রীলোকের গাড়ীতে একটা মোট দিয়া ছুটিল। কোনও গাড়ীতে স্থান নাই। বৃদ্ধ, লোকের গোলে পড়িয়া গেল। যুবতী চীৎকার করিয়া হুকুম দিতে লাগিলেন, "তুমি আমার বাপকে উঠাইয়া দেও।" আমি

দেখিলাম, আমার মন্দ হাকিম জোটে নাই। গাড়ীতে স্থান নাই। ষ্টেষণমাষ্টারের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আর একখানি গাড়ী জুড়িয়া লইলাম। তখন বহুতর অন্য লোকের সঙ্গে বৃদ্ধ উঠিল। সুন্দরী আবার আমাকে তলপ দিলেন। বলিলাম, "তোমার বাপ উঠিয়াছে।" প্রশ্ন—"তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ?" উত্তর—"দেখিয়াছি।" তখন তিনি আমাকে ছাড়িলেন। শুনিলাম, তিনি একজন মহাজনের বনিতা। প্রত্যেক ষ্টেষণে আমি বেড়াইবার সময় আমার সঙ্গে আলাপ করিতেন। তিনি জলন্দরে নামিয়া গেলেন, আমি লাহোরে চলিয়া গেলাম।

আমি কাশ্মীর যাইবার অবসর পাই নাই। শীতে যাইবারও সুবিধা নাই। অতএব কাশ্মীরকুসুমরাশি আমি বড় একটা দেখি নাই। তবে যাহা দেখিলাম এবং শুনিলাম, তাহাতে তাঁহাদের উপর আমার শ্রদ্ধা কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। তাঁহাদের আকৃতিতে কিঞ্চিৎ পুরুষে পুরুষে ভাব, যদিও রং অতুলনীয়; এবং শুনিলাম, তাঁহারা নিতান্ত অপরিষ্কার। সকলে বলিলেন, ইহাদের অপেক্ষা শিম্‌লা-অঞ্চলবাসিনী হিমালয়কন্যারাই সুন্দরী। ইহাদিগকে পাহাড়িয়া বলে। তাহার একটিমাত্র আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। প্রতুলের বাড়ীর পার্শ্বে একটি পাহাড়িয়া গৃহস্থ বাস করেন। তাঁহার একটি কন্যা সর্ব্বদা প্রাচীরের সে পাশে দাঁড়াইয়া, প্রতুলের দাসীর সঙ্গে কথা কহিত এবং প্রায়ই সে ও তাহার মাতা, নানা কায কর্ম্ম করিয়া বেড়াইত। মরি! মরি! কি রূপ! আমি অমন রূপ যেন কখনও দেখি নাই। শুনিলাম, তাহার নাম পার্ব্বতী এবং সে রূপেও ঠিক আমাদের পার্ব্বতী। তাহাকে দেখিয়া আমি বুঝিলাম, আমাদের

শাস্ত্রকার কেন আমাদের উমাকে হিমালয়ের কন্যা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাহাকে অসুর এবং সিংহের পিঠে চড়াইয়া দিলে, সে একটি জীবন্ত পার্ব্বতী হইবে। রূপে, লাবণ্যে, বর্ণে, শরীরের দৈর্ঘ্যে, সে যেন দক্ষ শিল্পকরের নির্ম্মিত একটি অপূর্ব্ব প্রতিমা। দূর হইতে যতদূর বুঝা যাইতেছিল, তাহার এই প্রথম যৌবন; এবং যে ভাবে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, তাহাতে আমার বোধ হইত,—সে একটি ফুল অপেক্ষা ভারি হইবে না। মরি! মরি! কি মুখ, কি চোক, কি নাসিকা, কি বর্ণ, কি ক্ষুদ্র অবয়ব, সর্ব্ব শেষ কি মধুমাখা ঈষৎ হাসি। তাহাকে আমি যতবার দেখিতাম, আমার বোধ হইত, যেন একটি রূপের স্বপ্ন দেখিতেছি। তাহার পোষাক পঞ্জাবী রমণীদিগের মত। তবে কথন কথন হিন্দুস্থানীদের মত সাড়ীও পরিতে দেখিতাম।

তাহার পর রাজপুতানা যাই। কি জয়পুরের, কি যোধপুরের, কি আজমীরের, কোন স্থানের রাজপুতনী আমি সুন্দরী দেখি নাই। কেবল চিতোরের রমণীরা একরূপ ইহার ব্যতিক্রম। মাড়ওয়ারের রমণীরা সর্ব্বাপেক্ষা রূপহীনা। রাজপুতনীদের পরিধান ঘাঘ্‌রা, কাঁচুলী ও ওড়না। ঘাঘরাটি ও আবার এক প্রকাণ্ড ব্যাপার, এবং উলঙ্গ না হইয়া যতদূর সাধ্য, তত দূর নাভির নীচে ঘাঘরার সম্মুখটি নামাইয়া পরিয়া থাকে। অতএব, কৃশাঙ্গিনীরা ছাড়া, অন্য মহিলারা বেহার-অঞ্চল-বাসিনীদের ন্যায় মহোদরী। কাঁচুলীও এরূপ ভাবে পরেন যে, ভারতচন্দ্রের কদম্বের ও দাড়িম্বের নিম্নের এক তৃতীয়াংশ তাহার বাহিরে থাকে, এবং তাহাতে বন্ধনের দাগ থাকে।

তাহার পর গুজরাটে চল। বরদার গুর্জ্জরীদের রূপ বর্ণনীয়

নহে। যে-দিক চাহিয়া দেখ, ষ্টেষণের মেথরাণী পর্য্যন্ত নয়ন মোহিত করিয়া দিবে। গুর্জ্জরীর "উরজরঞ্জন" ত আছেই, তাহা ছাড়া, ইহাদের মধ্যে 'তন্বী শ্যামা' প্রায় দেখিতে পাইবে না। গাইকোয়ারের মৃতা মহিষী লক্ষ্মীবাই হইতে পথের ভিখারিণী পর্য্যন্ত সকলই সুন্দরী। ইহারা বেহারের স্ত্রীলোকদের মত সাড়ী পরে, তবে শ্রাদ্ধটি তত নীচে গড়ায় না। কেবল ভারতচন্দ্রের কামদেবের প্রবেশার্থ, "নাভিকূপ" মাত্র অনাবৃত থাকে। মুসলমান সাম্রাজ্যের তরঙ্গ রাজপুতানার দক্ষিণে বড় আইসে নাই। মার-ওয়ার ছাড়িয়া আসিলে অবগুণ্ঠন আসিয়া পড়ে; তখন আর রমণী, অবগুণ্ঠন মধ্যে বদনচন্দ্র ঢাকিয়া, দর্শকের কৌতূহল বৃদ্ধি করে না। স্ত্রীস্বাধীনতাও ক্রমশঃ এখান হইতে মাথা তুলিয়া উঠি-তেছে, দেখা যায়। আর এক-পা অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাইবে, একেবারে চাঁদের হাট। মহারাষ্ট্রমহিলারা এখন "কাম-রঙ্গ পরিহরি রণরঙ্গে নাই বা মাতুন, তবে সেই পশ্চাৎ-কোঁচা-আঁটা বসন পরিধান, সেই অবগুণ্ঠনশূন্য প্রফুল্ল পদ্মমুখ, সেই অসঙ্কোচ গমন দেখিলে, ইঁহারা এক কালে যে রণরঙ্গে মাতি-তেন, তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়। মস্তকমুণ্ডিত, পর্ব্বতবৎ-পাগড়ী-সজ্জিত, মহারাষ্ট্রীয় পুরুষদিগকে দেখিতে বড় ভাল দেখায় না, কিন্তু তাঁহাদের অঙ্গনারা পরম রূপসী। তাঁহাদের কেবল কপোলদেশটার অস্থিটা যেন কিঞ্চিৎ বেশী পরিদৃশ্যমান। তাঁহাদের বসনপরিধানের নিয়মটিই কেবল স্বতন্ত্র; এরূপ নহে; তাঁহাদের কবরীবন্ধনেও কিঞ্চিৎ নূতনত্ব আছে। কবরী এক-বেণীবদ্ধ করিয়া, তাহা চক্রাকারে পশ্চাৎ দিকে রাখা হয়। মাথার পশ্চাতে যেন একটি চাঁচর চক্র,—প্রেমফাঁসির গ্রন্থি!

প্রাণে প্রাণে যে ফিরিয়া আসিয়াছি, সে কেবল তোমার কপালের জোরে। মহারাষ্ট্রীয় সুন্দরীরা সর্ব্বত্র অবলীলাক্রমে বিরাজ করেন; কি উদ্যানে, কি বাদ্যস্থানে, তাঁহারা সম্মুখ কোঁচার অগ্রভাগ বামহস্তে লীলা করিয়া ধরিয়া, পাদুকাশূন্য চরণে বিচরণ করিয়া বেড়ান। সঙ্গে কিন্তু একটি পুরুষ মানুষ থাকেন। এ দৃশ্য ঘোমটা মধ্য হইতে উঁকি-বিক্ষেপিনী বঙ্গমহিলাদের ও তাঁহাদের আড়ে-ঠারে-দৃষ্টি-সঞ্চালনকারী রসিক পুরুষদিগের দেখিবার যোগ্য, শিখিবার যোগ্য। এই পুণ্যবতীদের দর্শনেও মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ এবং পবিত্রতা সঞ্চারিত হয়। রাজস্থান ছাড়িয়া গেলে আমার বোধ হইল, যেন সম্পূর্ণ একটি সৌন্দর্য্যপূর্ণ নূতন জগতে প্রবেশ করিলাম। কবি বলিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত রমণীর হাসিতে আলোকিত না হইয়াছিল, জগৎ অরণ্য ছিল। কথাটা বড় গভীর। আমাদের বঙ্গসমাজ রমণীর হাসিশূন্য, আমাদের জীবন তাই এত উৎসাহহীন, এত আনন্দশূন্য। যবন রাজ্য আমাদের আর যে সকল অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা অতি সামান্য। নিপীড়িত হিন্দুধর্ম্ম মাথা তুলিয়াছে, ব্যক্তিগত নিপীড়ন সমাজহৃদয় স্পর্শ করে নাই। কিন্তু আমাদের সমাজে এই স্ত্রী-অবরোধস্বরূপ যে অর্দ্ধাঙ্গ বা পক্ষঘাত রোগ সঞ্চার করিয়াছে, তাহার উপসর্গে সমাজ এই ৭০০ বৎসর পরেও মাথা তুলিতে পারিল না।

কেবল মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে বলিয়া নহে, পার্শীদের মধ্যেও এই পাপ প্রবেশ করে নাই। তাহাদের রমণীরাও রূপে চারিদিক আলোকিত করিয়া সর্ব্বত্র বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। হিন্দুসুন্দরীরা চম্পকবরণী। পার্শী রূপসীদের বর্ণ সদ্যপ্রস্ফুটিত

শিশিরসিক্ত পদ্ম ফুলের মত। ইহুদীরা ভিন্ন ইহাদের তুলনার স্থান আর নাই। ইহাদের সাড়ীই বোম্বাই সাড়ী। সাড়ীর উপর একটি মলমলের আজানুলম্বিত পিরাণ; তাহার উপর জ্যাকেট্। ইহাঁরা মাথার চুল ঢাকিয়া একখানা সাদা রুমাল বাঁধিয়া তাহার উপর খোঁপা মাত্র ঢাকিয়া মাথায় কাপড় দিয়া থাকেন। পিরাণের দৈর্ঘ্য এবং কাল চুলে সাদা কাপড়ের বন্ধনটি কেমন আমাদের চক্ষে ভাল লাগে না।

আমরা অপরাহ্নে নাসিকে পৌঁছি। যে পাণ্ডার বাটীতে গিয়া উঠি, তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহারা পাঁচ সহোদর। পাঁচটি স্ত্রীই সুন্দরী। আমি মাথা ধুইয়া উপরে যাইতেছি, নীচে ক্ষুদ্র অগ্নিশিখার ন্যায় একটি বালিকা বসিয়া আছে। আমি তাহাকে ডাকিলে সে এক লম্ফ দিয়া আমার বুকে উঠিয়া পা দুখানি দিয়া আমার কোমর জড়াইয়া ধরিল, এবং দুখানি ক্ষুদ্র হাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া আমার মুখের উপর মুখ রাখিয়া কি বলিতে লাগিল। বুঝিলাম একটি কথা দকষীণা (দক্ষিণা)। তাহার নাম ভগ্‌গুা। বয়স ৬।৭ বৎসর; বিবাহ হইয়াছে তিন বৎসর। বালিকা দিনে শ্বশুরবাড়ীতে, রাত্রিতে পিতার বাড়ীতে থাকে। আর একখানি ঈষৎশ্যাম বদন পার্শ্বের কক্ষ হইতে উঁকি মারিতেছিল। ভগ্‌গুাকে তাহাকে ডাকিতে বলিলাম। সে হিহি করিয়া হাসিয়া, বীণার পঞ্চমে ডাকিল—"রুকু! ইক্রি আ।" রুকু আসিল। তাহার বয়স ৮ কি ৯ বৎসর হইবে। বড় সুন্দরী! তাহাকে আমার কাছে ডাকিয়া আনিলে সে কিঞ্চিৎ সলজ্জ ভাবে দাঁড়াইয়া, অমনি,হাত বাড়াইয়া বলিল,—"দকষীণা"। অমনি তাহার শ্বাশুড়ী আসিতেছে বলিয়া ছুটিয়া গেল। আমি

উপরে গেলে আবার যাইয়া বলিল, "দক্ষীণা"। যাইবার সময় দিব বলিলে বলিল, তাহার শাশুড়ী দেখিবে, সে আসিতে পারিবে না। তাহার পর ছুটিতে সিঁড়ির উপর বসিয়া কত গান গাহিতে লাগিল। আমি কাছে গেলে ভগ্গুাটি গলায় জড়াইয়া ধরে, রুক্কু পালায়। সে এ বাড়ীর পুত্রবধূ। অতএব দেখিলে, ইহাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ যেরূপ ভাবে প্রচলিত ; শুনিলে সমাজসংস্কার-গণ মূর্চ্ছা যাইবেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত স্ত্রী-সংস্কার না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে স্বামীর সাক্ষাৎ হয় না। ইঁচড়ে পাকান ব্যাপার আমাদের বঙ্গদেশের লোকে যেমন মোক্ষ মনে করেন, ইহারা সেরূপ মনে করে না। এই জন্যই বঙ্গদেশের রমণীরা অকালকুষ্মাণ্ড হইয়া পড়ে। যৌবনের প্রারম্ভে বৃদ্ধা, ফুল ফুটিতে না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়ে।

পতিপত্নীর জীবনের সুখ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয় ; তাহা ছাড়া সন্তানেরা ক্ষীণপ্রাণ, ও রোগগ্রস্ত হইয়া, পিতা মাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। ভগবান কতদিনে সমাজকে এ পাপের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবেন, তাহা তিনিই জানেন!

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আহার করিতে বসিলাম। সম্মুখে পাতা দেখিয়া আমি হাসিতেছি দেখিয়া, সুন্দরী তাহা উঠাইয়া লইয়া আমাকে একখানি থালা দিলেন। আমরা খাইতে বসি-লাম। সুন্দরী পরিবেশন করিয়া সম্মুখে বসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলেন। এ আলাপ—

"সীতা নাড়ে হাত, বানরে নাড়ে মাথা।"

তিনি হিন্দি বুঝেন না, আমি মহারাষ্ট্রীয় বুঝি না। প্রেমিক খুড়া গাইয়াছেন—

"নয়নে নয়নে যদি হৃদয়ে হৃদয়ে,
বালীর বাঁধে রোধে কি হে অসীম সলিলে ?"

দুটি মানব হৃদয় যদি কথা কহিতে চাহে, ভাষা তাহার প্রতি-বন্ধকতা করিতে পারে না। আমরা নয়নে নয়নে, হৃদয়ে হৃদয়ে কথা কহিতে লাগিলাম। ঠাকুরাণীটির নাম অম্বা। সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নারায়ণ না দিলে কি করিব ?" আমি বলিলাম, নারায়ণের দিবার এখনও বিস্তর সময় পড়িয়া আছে। তিনি আমার নাম ধাম, সর্ব্ব শেষ লক্ষ্মীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি লক্ষ্মী-ছাড়া হইয়া আসিয়াছি কেন, তাহারও কৈফিয়ৎ চাহিলেন। পুত্র-টির কথাও অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি পা ছড়াইয়া সম্মুখে বসিয়া এরূপে ঈষৎ হাসিয়া হাসিয়া, প্রীতিবিস্ফারিত-নয়নে চাহিয়া চাহিয়া, বীণার কোমল স্বর-মালা সংমিলিত করিয়া, আলাপ করিতেছিলেন, আর সময়ে সময়ে আমাকে "চাউল দে ! ওয়ারণ দে" (ভাত দি, ডাল দি) বলিতেছেন। যদিও খাইবার কিছুই ছিল না, তথাপি সে ডাল ভাত কি আনন্দেই আহার করিলাম !

শুইলাম। পূনা হইতে দীর্ঘকাল রেলবিহারে শরীর অবসন্ন হইয়াছিল। শুইবামাত্র নিদ্রা আসিল। রাত্রি ১০৷১১টা হইবে। নীচে রমণীকণ্ঠের ও হাসির মিশ্রিত তরঙ্গ উঠিয়াছে। আমি উঠিয়া একটা প্রয়োজনে নীচে গেলাম। মরি—কি দৃশ্য ! ইহাঁরা স্বামীকে "ধনী" বলেন। কথাটা সার্থক। এরূপ রূপরত্ন যাহাদের, তাহারা ধনী বই কি ? সংসারের সাররত্ন রমণীরত্ন। যাঁহাদের "ধনী" বাড়ী আছেন, তাঁহারা আপন আপন কক্ষে গিয়া ধনভোগ

করিতেছেন। তিন সুন্দরীর “ধনী” বাড়ী নাই। ইহারা এক প্রদী-পের আলোকে বসিয়া, হাঁটু হইতে পায়ে এ রাত্রিতে তৈল মাখিতেছেন, হাসিতেছেন, গল্প করিতেছেন। রূপ, আনন্দ, বীণার ঝঙ্কার ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি মুহূর্ত্ত মাত্র দাঁড়াইয়া এই আনন্দবাজার দেখিলাম, চলিয়া গেলাম। তাঁহারা কোনও সঙ্কোচই মনে করিলেন না। তারাচরণেরও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। কিঞ্চিৎ পরে অম্বাদেবী, তাঁহার পশ্চাতে প্রদীপ হস্তে অন্য এক সুন্দরী, আমাদের কক্ষদ্বারে আসিয়া হাসিতে লাগিলেন। না বুঝি হাসি, না বুঝি ভাষা। মহা বিপদে পড়িলাম। তারাচরণের মুখ শুকাইয়া গেল। অম্বা দেবী আমাকে ইঙ্গিত করিয়া, আমার বিছানা গুড়াইতে বলিলেন। আমি গুড়াইতেছি, তিনি বিদ্যুৎ-বৎ ছুটিয়া যাইতে শ্রীচরণ একখানিতে তড়িদাহত হইলাম। তিনি একটি চোরকুঠারি খুলিলেন, এবং সেখান হইতে একটি বিছানার তাড়া টানিতে টানিতে হাসিতে লাগিলেন। সোপা-নের শীর্ষ-দেশস্থা দীপহস্তা সুন্দরীও হাসিতেছেন। উভয়ের সে উচ্চ হাসি, সেই উচ্চ রসিকতাপূর্ণ কথা, দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুই বুঝিতেছি না। তারাচরণ ভয়ে কাঁপুক, আমি ভাবিলাম, মেয়ে মানুষের কাছে অপ্রস্তুত হইব কেন, দাঁড়াইয়া সে হাসিতে যোগ দিলাম। তারাচরণ চীৎকার করিতে লাগিল,—“আরে ও বাবু বৈস!” আমি বলিলাম, “ভয় নাই; হরনেত্রানল নহে, আমরা কামদেবের মত ভস্ম হইব না।” রমণীদের রঙ্গরসও কিছুই বুঝিতেছি না, কিন্তু তারাচরণ যেন ঠিক দুই ফাঁসিকাষ্ঠের মধ্যে অবস্থিত। দুই দিকে দুই সুন্দরী। পলাইবারও পথ নাই। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার হাসিতে হাসিতে পার্শ্ব ফাটিয়া যাইতে-

ছিল। বোধ হয় রমণীরাও তাহা দেখিয়া হাসিতেছিলেন। আমাদের একতরফা সমাজের কল্যাণভদ্র রমণীর কাছে পড়িলে বাঙ্গালীকে কি বিভ্রাটেই পড়িতে হয়। দেবীরা একটি বালিশ লইয়া, বাকি বিছানা ছড়াইয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি বলিলাম,—"কেমন তারা! ইহাদের "ধনীদের" আজ বাড়ী না থাকাটা ভাল হয় নাই।" এতক্ষণে তাহার মুখে হাসি আসিল, বিপদ কাটিয়া গেল। সুন্দরীরা নীচে গেলে বোধ হয়, 'এক জন পুরুষ আসিয়া, অতিথি বাড়ীতে আছে, তথাপি এইরূপ হৈ-রৈ করিতেছেন বলিয়া ভৎ'সনা করিল। তাহার পর গৃহ নীরব হইল। পর দিন অম্বাদেবী আর বড় কাছে ঘেঁসিলেন না। একবার বিষণ্ণ ভাবে দূর হইতে দেখা দিয়া, যেন নয়নের ভাবে বলিলেন, "পোড়ার মুখ! তুমি আমাকে গাল খাওয়াইয়াছ!" এ বেলা প্রদীপধারিণী আমাদের অন্নপূর্ণা হইলেন। তিনি অম্বাদেবী অপেক্ষা প্রাচীনা। আহার করিতেছি, আহা কি দৃশ্য! নীচে একটি বকুলবৃক্ষের তলায় একখানি শ্রীমদ্ভাগবত রাখিয়া, একটি গৃহলক্ষ্মী তাহা প্রদক্ষিণ করিতেছেন, এবং প্রত্যেকবার ঘুরিয়া আসিয়া, গ্রন্থকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছেন। তাঁহার মধ্যম যৌবনের উত্তাল তরঙ্গায়িত রূপ, তাঁহার সেই ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণ মুখশ্রী, সেই চক্রাকার ভ্রমণ, সেই গ্রীবাভঙ্গী, সেই কক্ষ-আন্দোলন, সেই পদসঞ্চালন, আমি এ জীবনে ভুলিব না। তিনি সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহধর্ম্মিণী, গৃহের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মী। শুনিলাম, প্রতি-দিন এ পরিবারের মঙ্গল কামনা করিয়া, এরূপে সহস্রবার প্রদক্ষিণ করেন। বুঝিলে কি, একবার কাণ্ডখানা কি? বঙ্গদেশে এ পবিত্র দৃশ্য একদিন দেখিতে পাওয়া যাইত। এখন সে স্বর্গ

বঙ্গদেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছি। বঙ্গসুন্দরীদের স্বামী এখন গুরু নহে, দেবতা নহে, একটি সামান্য শাসনের বস্তু। স্বামীর পরিবার পরম শক্র। তাহার ধর্ম্ম এখন স্বামীশাসন, * * * কিম্বা স্বামীর চরিত্র সমালোচন করিতে করিতে ২।৪ বার অঙ্গুলী-ভঙ্গী, ২।৪টি সাপের মন্ত্রের মত মন্ত্রপাঠ! এরূপ ভাবে যদি কাহাকেও একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ২।৪ বার প্রদক্ষিণ করিতে বল, তথনই ডাক্তার ডাকিতে হইবে; মাথায় বরফ ঢালিতে হইবে। আমরা সভ্য হইতেছি, উন্নত হইতেছি, এবং অন্ধকার হইতে আলোকে আসিতেছি। এই সাধ্বীর এই প্রদক্ষিণব্রত দেখিয়া, হৃদয় আমার কি পবিত্র, কি মহিমাপূর্ণ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের এ সকল সীতা সাবিত্রী কোথায় গেল?

আহার করিয়া আমরা রওনা হইলাম। কাপড় পরিতেছি, প্রদীপধারিণী বড় কোমল স্নেহময় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কি সত্য সত্য আজই যাইবে?" আমি বলিলাম,—"তোমাদের স্নেহের জন্য ধন্যবাদ, আজিই যাইব।" তাহাদের শ্বাশুড়ীর হস্তে বধূদের জন্য কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া, আমরা বাড়ী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটি দোকানে একটি ঘটী কিনিলাম। যথন গাড়ীতে উঠিতেছি,—অপরদিকের দোকানে দাঁড়াইয়া কে?—সেই প্রদীপধারিণী!

তাহার পর নর্ম্মদা। এথান হইতে অবরোধপ্রথার আরম্ভ হইয়াছে। যে পাণ্ডার বাড়ীতে আহার করিলাম,—ঘরথানি কুটীর, কিন্তু কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন!—পাণ্ডা বলিলেন, আমি সস্ত্রীক থাকিলে ব্রাহ্মণীরা বাহির হইতেন।

নর্ম্মদা হইতে প্রয়াগ, প্রয়াগ হইতে ঊষায় হাবড়া পঁহুছিয়া, সেতু বাহিয়া যখন গঙ্গা পার হইতেছি, তখন দেখিলাম, দুই ধারে ঊষাস্বরূপিনী বঙ্গদিগম্বরীগণ অবগাহন করিতেছেন। তখন মনে হইল,—

"কে চায় খাইতে মধু বিনা বঙ্গকুসুমে?
কোথা হেন শতদল,
বুকে করি পরিমল,
থাকে পতিমুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে?
বঙ্গকুল বধূ বিনা মধু কোথা কুসুমে?"

সম্পূর্ণ।

৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, "সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে"
শ্রীসিদ্ধেশ্বর পান দ্বারা মুদ্রিত।

লীলা।

—

উপন্যাস।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত।

লীলা গার্হস্থ্য উপন্যাস। সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের কথায় লীলা পূর্ণ। উপন্যাসখানি বাঙ্গালীর সংসারের উজ্জ্বল ছবি। এমন পারিবারিক ঘটনাপূর্ণ সুন্দর উপন্যাস "স্বর্ণলতার" পর আর দেখা যায় নাই। বর্ণনা সুন্দর, মধুর; ভাষা মিষ্ট ও প্রাঞ্জল; গল্পটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মনোহর।

লীলা পড়িলে সংসারের অনেক কথা শেখা যায়;—ইহাতে ভাবিবার, বুঝিবার, দেখিবার, শিখিবার মত অনেক কথা আছে। উপন্যাসপাঠের আমোদের সঙ্গে সঙ্গে মানবচরিত্রের কুটিল তত্ত্বে জ্ঞানলাভ হইবে। যাঁহারা বাজে বই পড়িয়া বিরক্ত হইয়াছেন, তাহারা এক বার "লীলা" পড়ুন। লীলার দুঃখে পাষাণের চখেও জল আসে!

প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ; প্রবাসের পত্রের মত আকার। কাগজ ও ছাপা ভাল। মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র; মাশুলাদি ৵০ দুই আনা মাত্র। ভ্যালুপেবলে লইলে ৵০ দুই আনা অধিক পড়ে।

সাহিত্য।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

তৃতীয় বর্ষ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।

"সাহিত্যে" প্রতি মাসে উপন্যাস, গল্প, নক্সা, সমালোচনা, ইতিহাস, জীবনচরিত, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন, সমাজনীতি, সাহিত্য, কবিতা, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, রহস্য, প্রভৃতি বিষয়ে, সুন্দর ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হয়। "সাহিত্যের" আকার "নবজীবনের" মত, কোনও কোনও মাসে তদপেক্ষা বড়ও হয়। ছাপা ও কাগজ খুব সুন্দর ; এ বিষয়েও "সাহিত্যের" প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বার মাসে বার সংখ্যায় এক বর্ষ গণনা করা হয়। **এক বৎসরের অগ্রিম মূল্য, ডাকমাশুল সমেত ২৲ দুই টাকা মাত্র।** অগ্রিম মূল্য না পাইলে, কাহাকেও "সাহিত্য" পাঠান হয় না। ভ্যালুপেবলে পাঠাইতে বলিলে পাঠান হয়, তাহাতে গ্রাহককে ২৶০ দুই টাকা দুই আনা দিতে হয়। এক সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা না পাঠাইলে নমুনা দেওয়া হয় না।

সাহিত্য-কার্য্যালয়।
২৩নং বিদ্যাসাগরের ষ্ট্রীট্।
কলিকাতা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
কার্য্যাধ্যক্ষ।